

সংবাদ প্রতিদিন
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১০
রোববার
মাতৃভাষা
সংবাদ প্রতিদিন এর সঙ্গে বিনামূল্যে



পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড ও স্ক্যান : নেট থেকে প্রাপ্ত

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

প্রতিদিন

রোববার

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা বসু, প্রসূন চক্রবর্তী, বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী, বিপুল গুহ, ভাস্কর লেট, রিংকা চক্রবর্তী রাজু সরদার, শান্তনু দে, সন্তোষ দত্ত, সুপ্রিয় দাস

সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে



ভাষা নাকি অনন্ত বেগবতী, আবহমানা।

তার চলার পথে কুড়িয়ে নেয় নানা সদ্যসিক্ত ভাসমান কুসুমহার, আবার সহজেই বর্জন করে বহুদিনের বর্জ্য অর্ঘ্য।

নদীর নীচে যেমন পলিমাটি জমে, বহতা ভাষাও খুঁজে পায় সিক্ত পোক্ত ভূমি, তার পথভিত্তি।

স্কুলে যখন প্রথম আবিষ্কার করেছি যে কত তৎসম শব্দ দিয়ে সৃজিত হয়েছে বাংলা ভাষাভাণ্ডার, তখন আশ্চর্যও লাগত যেমন, হয়তো বা গোপন কোনও এক জাত্যভিমানের চাপা অহঙ্কারও থাকত, সিধে সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষার উত্তরাধিকারী আমরা।

আজও যেমন নবজাতকের নাম রাখলে আমরা তার উৎস খুঁজতে অধিকাংশ সময়ে অভিধান-এ তার তৎসম রূপ এবং অর্থ খুঁজি—যেন আমাদের মেনে নিতে কষ্ট হয় বাংলাভাষার কোনও নাম দেবভাষা উদ্ভূত আর্যনাম নয়।

বাংলাভাষার সর্বনামের বা ক্রিয়ার কোনও লিঙ্গ নেই। হিন্দিতে আছে। তাই আমাদের জ্ঞানে এবং চেতনায় হিন্দিভাষা বাংলাভাষার থেকে কম সার্বভৌম।

সেখানে পুলিশ বা রেলগাড়ি নাকি স্ত্রীলিঙ্গ, অতএব সে-ভাষা বিচক্ষণের ভাষা হতেই পারে না।

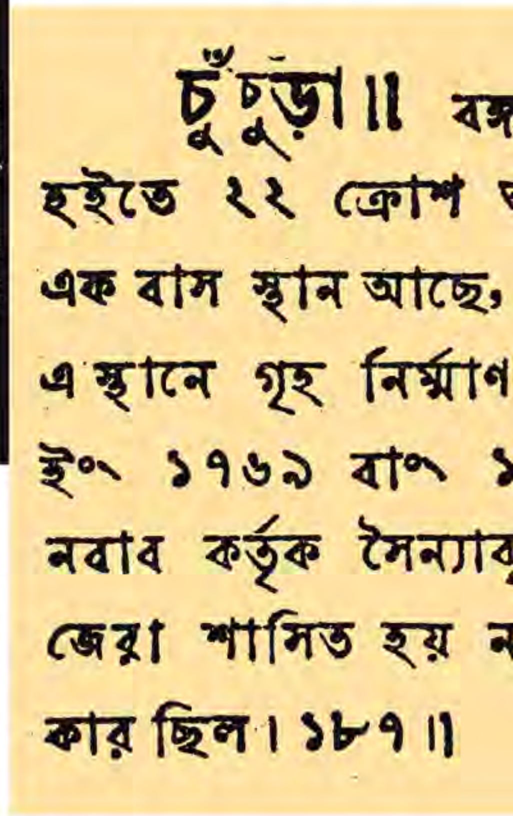
তা ছাড়া, আমরা শিক্ষিত বাঙালি। জানি যে বাংলায় শুধু একজন বিদ্যাসাগরই নেই, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ আছেন। বিভূতি-মানিক-তারাশঙ্কর আছেন। অন্য দিকে জীবনানন্দের অনন্যতার পাশাপাশি বুদ্ধদেব-সুধীন-বিষ্ণু আছেন। শক্তি-সুনীল-শীর্ষেন্দু আছেন।

হিন্দিতে কেবল আছেন এক প্রেম চন্দ আর কিষেণ চন্দ। কবিতায় কইফি আজমি আর হরবনস্ রায় বচ্চন। শেষ দুজনের পরিচয় প্রধানত শাবানা আজমি এবং অমিতাভ বচ্চনের পিতৃপরিচয়ের অধিকারে।

ফলে একটা সময় অবধি, বাংলার শিক্ষিতমণ্ডলীর কাছে হিন্দিভাষাটা ব্রাত্য হয়ে রইল—এ যেন সুন্দরী, আলোকপ্রাপ্তা, সালঙ্কারা মায়ের পাশে কোনও এক অল্পশিক্ষিতা, ম্লানমুখী অপরের মা'কে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখা।

তার পাশে কলকাতা শহরের অহংকার, সেই যে পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশরা এসে বাংলায় ঘাঁটি গাড়ল আর ইংরিজি ভাষা এসে গঙ্গার জোয়ারের মতো রোজ ছুঁয়ে যেতে লাগল কলকাতা শহর, তার পরে বাংলা ভাষাও তার সংগ্রহের অন্যান্য অনেক ভাষা থেকে কুড়িয়ে আনা ভালবাসার শব্দগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিতে লাগল জানলা দিয়ে। পেয়ালা, পিরিচ, দেরাজ, কুর্সি ধীরে ধীরে কাপ-প্লেট, ড্রয়ার-চেয়ারের কাছে বিনম্র কুর্নিশ করে বিদায় নিল। হয় ঠাঁই নিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর হলদেটে হয়ে যাওয়া বইগুলোর পাতায়-পাতায়, কিংবা হারিয়ে গেল গভীর রাতের নির্জন পথের মতো সমবেত 'বলো হরি-হরি বোল'-এর আড়ালে।

বাংলা ভাষা, আমাদের মাতৃভাষা, চলন্তিকা ও হরিচরণের কৃপায় অবিকৃত অবিচল রইল, কিন্তু সংস্কৃতের উৎসমুখ থেকে বাংলা ভাষার ভগীরথ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যে বাংলা ভাষার সুরধুনী স্রোত ক্রমশ এক বেগবতী নদীর আকার ধারণ করেছিল, তাতে এখন আর কোনও ছই নৌকো, পানসি, ডিঙ্গি নেই, কেবল বিদেশি পালতোলা নৌকো।



চুঁচুড়া॥ বঙ্গ
হইতে ২২ ক্রোশ
এক বাস স্থান আছে,
এ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ
ইং ১৭৬৯ বাং
নবাব কর্তৃক সৈন্যা
জেরা শাসিত হয়
কার ছিল। ১৮৭॥

একদিন যেমন হিন্দি ভাষাকে ব্রাত্য করে দিয়ে বাংলা ভাষার গৌরব হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত, তেমনই আজ বাংলাভাষার অর্ধেকটাই জুড়ে আছে ইংরিজি শব্দ। আমরা বাড়ির কাজের লোকেদের সামনে নিজস্ব কথা বলতে হলে ইংরিজিতে বলি, অস্বস্তিকর শব্দ জনসমক্ষে ব্যবহার করতে হলেই ইংরিজি প্রতিশব্দ তাকে শোভন করে দেয়, নিত্য ব্যবহারিক ইংরিজি নামধারী যে দ্রব্যগুলি আমাদের কাছে রোজ এসে পৌঁছয় তারা তেমনই অটুট থেকে যায় সাগরপারের বৈভবে।

বাংলাদেশে অন্তত ইংরেজিকে এতটা প্রাধান্য না-দিয়ে, ব্যবহারিক শব্দগুলোয় বাংলা বজায় রাখার চর্চাটা চলে নিরন্তর। ওখানে মোবাইল ফোনের নাম 'মুঠোফোন'। ওখানে দোকানের দরজায় Push বা Pull-এর বদলে থাকে 'টানুন-ঠেলুন'।

আমরা সেগুলো দেখে এসে মজা পাই। অনেকে ন্যাকামিও মনে করেন। কিন্তু বোধহয় ভাবেন না যে বিদেশি দ্রব্যসমৃদ্ধ এই দেশটা যদি বাংলাভাষাকে তার মূল বাকস্রোত হিসেবে নিষ্কলুষ ভাবে ধরে রাখতে পারে—সেটা নিঃসন্দেহে মাতৃভাষার প্রতি এক নিয়ত নম্রতার নিদর্শন।

তর্কটা হল, বাংলাদেশ একভাষী দেশ। ভারতের মতো সেখানে নানা ভাষা, নানা মত নয়। ফলে বহুভাষী দেশের বহু মাতৃভাষার যে আদান-প্রদান, সেটার মধ্যে দিয়ে সত্যি যদি ভারতবর্ষের জন্য এক নতুন মাতৃভাষা সৃষ্টি হত সেটাই বোধহয় হত শ্রেয়, অভিপ্রেত।

দেশে গঙ্গার পশ্চিম দিগে ও কলিকাতা
অন্তরে চুঁচুড়া নামে ওলন্দাজ জাতিদিগের
ইং ১৬৫৫ বাং ১০৬২ শালে ইহারা
করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বাস করত
১৭৬ শালে রাজকর নিমিত্তে বঙ্গ দেশীয়
ত হইয়া যুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি ওলন্দা
াই, এবং তৎকালে ইংলণ্ডীয়দিগের অধি

সত্যি যখন বহুভাষাভাষী মানুষ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে 'জনগণমন' গান, তাঁরা বা বাংলাভাষী আমরাও কি সচেতন ভাবে স্মরণ রাখি যে এটা আদতে একটি মৌলিক বাংলা রচনা?

কিন্তু আমাদের মাতৃভাষা—সে যে প্রদেশেরই হোক না কেন নবকলেবর পাচ্ছে একটাই ভাষা থেকে যার নাম—ইংরিজি। আর তার ফলে সনাতন আর আধুনিকের এক নিয়মিত গুরুচণ্ডালিতে বাংলা ছবির বিজ্ঞাপনে দেখছি

—চ্যালেঞ্জ, নিবি না শালা

এবং তার তলায়

'সগৌরবে চলিতেছে'।

'মা যা ছিলেন' তা নিয়ে সকলেরই স্মৃতিমেদুরতা থাকে। কিন্তু 'মা যা হইয়াছেন'-এর নমুনা যদি এগুলোই হয়, তা হলে আর দশ বছর পর একুশে ফেব্রুয়ারি 'মা যা হইবেন' সেটা আমাদের সহ্য হবে তো?

না কি অভ্যেসও শরীরের মতো মহাশয়? যা সওয়াবে তাই সয়?



পরিচয়, ভাল লাগা বইটির সঙ্গে

ঠিক যে-বয়েসে দেখা হওয়া উচিত, সেই বয়েস আঠেরোতেই দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। এবং তারপর যে কতবার গিয়েছি ঘুরে-ফিরে এই ধ্রুপদী দুহিতার কাছে! পরমা সুন্দরী এ-মেয়ে বালিকাবেলা পেরিয়েই পরমানন্দে বেশ্যা, বারো বছর ধরে। বিয়ে করল পাঁচবার, একবার তো এক ভাইকে। বারো বছর ধরে চুরি করেও কামালো, জীবন চালাল। তারপর আট বছর অন্য শহরে চালাল লুঠতরাজ। এই করতে-করতে সুন্দরী হয়ে উঠল বিশেষ ধনী। শুরু বিলাস আর সম্ভোগের পুণ্যজীবন। জীবনের শেষে বর্ণময় পাপের জন্য সামান্য শৌখিন শোচনা। যাঁরা এতক্ষণে চিনতে পেরেছেন এই ভুবনবিখ্যাত নায়িকাকে তাঁরা রোববারের আলস্যে পুরনো ভাললাগার তাপ নিতে পারেন। আর যাঁরা এখনও তেমন ঠাওর করতে পারেননি, তাঁরা তৈরি হতে পারেন নতুন উত্তেজনার জন্য। আর পাঠিকারা হতে পারেন ঈর্ষায় 'সবুজ'—এমন এক পরমার গল্প শুনতে-শুনতে। আমার ধারণা, এ-মেয়ে ঘুমিয়ে আছে সব মেয়ের মধ্যেই। কিন্তু সমাজ-সংসার-সংস্কারের চাপে কোনওদিন সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেনি। সে-ই কিন্তু সব পুরুষের স্বপ্নবনিতা। এ-মেয়ের গল্প সংক্ষেপে বলছি তার নিজের লেখা স্মৃতিকথা থেকে টুকরো-টুকরো তুলে এনে।

এক

আমি আমার ছেলেকে একদিন একটি উপহার দিলাম। মূল্যবান জিনিস বলতে ওই একটি জিনিসই ছিল আমার কাছে—একটা সোনার ঘড়ি। আমি ছেলেকে বললাম, আমার কাছে তোকে দেওয়ার মতো আর কিছু নেই, এই ঘড়িটা ছাড়া। আমার মনে-মনে ইচ্ছে ও যেন আমার কথা ভেবে ঘড়িটাকে মাঝে-মধ্যে চুমু খায়। শুধু একটি কথা ওকে বলতে পারিনি। ঘড়িটা আমি চুরি করেছিলাম এক ভদ্রমহিলার কাছ থেকে।

দুই

একদিন লোকটা হঠাৎ এসে বলল, চুক্তিপত্র নিয়েই এসেছি, সই করো, আজ থেকে তুমি আমার বউ।

আমি বললাম, পাগল হয়ে গেলে না কি? আমি করব বিয়ে! তুমি ভাবলে কী করে যে আমি তোমাকে বিয়ে করতে এককথায় রাজি হয়ে যাব!

—ঠিক ধরেছ। আমি সেই কথাই ভেবেছি, বলল লোকটা।

—ভুল ভেবেছ, সম্পূর্ণ ভুল, বললাম আমি।

—হতেই পারে না। তুমি আমাকে 'না' বলতেই পারো না। তুমি 'না' বললে আমি শুনবই না। তুমি আমার। আমি বঞ্চিত হতে আসিনি। তুমি আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

এ-কথা বলতে-বলতে লোকটা আমাকে জোরে জাপ্টে ধরে চুমু খেতেই লাগল। কিছুতেই ছাড়ছে না। এত তীব্র নিবিড়ভাবে চুমু খাচ্ছে আমি নিজেকে ছাড়াতেও পারছি না।

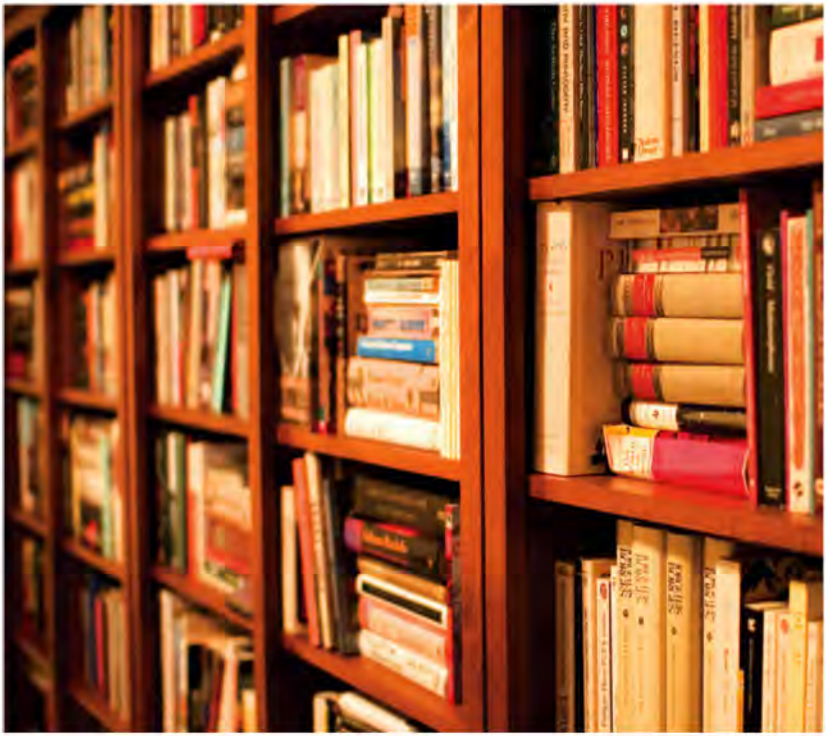
ঘরের মধ্যে একটা বিছানা। বিছানার পাশেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ওর আদর চলছে। তার সঙ্গে চলছে ওর জবরদস্তি, ওকে বিয়ে করতেই হবে, আর আমি ক্রমাগত 'না-না' করে চলেছি। ও হঠাৎ আমাকে বিছানায় ফেলে দিল। তারপর আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাকে দু-হাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরে পিষতে লাগল। আমার কিন্তু এতটুকু খারাপ লাগছিল না। মনেই হল না লোকটা কোনওভাবে অশালীন আচরণ করছে। ও আমাকে আদর করছিল without the least offer of 'undecency' এবং শেষ পর্যন্ত courted me to consent with such repeated entreaties and arguments—বলেই ফেললাম, ওর চুমুতে অবশ হয়ে গিয়ে, আচ্ছা বাবা, আমি রাজি তোমার বউ হতে! ও কিন্তু তখনও আমাকে ছাড়ল না। আদর করেই চলল। আর বলেও চলল, I must not be denied, I won't be denied, I can't be denied.

এবার আমি ওকে চুমু খেলাম। বললাম, তোমাকে বঞ্চিত করব না, করব না, প্রমিস, you shan't be denied. পাগল কোথাকার। Let me get up.

আমি রাজি হওয়ায় ও যেন আরও খেপে গেল। ও সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল বিছানার পাশে। আমাকেও দাঁড় করাল। আবার আদর। ও আনন্দে তখন কাঁদছে। পুরুষটার চোখে জল দেখলাম!

তিন

আমি তরুণী, আমি সুন্দরী। পকেটেও কিছু অর্থ আছে। সুতরাং বহু পুরুষের আদর পাচ্ছি। পুরুষরা বেশিরভাগই ছোটখাট ব্যবসায়ী। একজনের তো জামাকাপড়ের ব্যবসা। সে একটু বেশি-বেশি আদর করে। আমি ইতিমধ্যে বিধবা হওয়ার পর ওর বাড়িতেই থাকতে লাগলাম। এখানে আমোদ-আহ্লাদের পূর্ণ সুযোগ পেলাম আমি, here I had all the liberty and all the opportunity to be gay and appear in company that I could desire. আমার বাড়িওলার বোনটা যা খুশি তা-ই করত, এরকম আমুদে মেয়ে আমি দেখিনি, চরিত্রটরিত্র-র বালাই ছিল না ওর, ওর পাল্লায় পড়ে আমিও ভেসে গেলাম। পুরুষের শরীর আর আদর যে কী পরিমাণে পেয়েছি! I was here wonderfully caressed, had abundance of admirers and such as called themselves lovers, ওরা সবাই নিজেদের পরিচয় দিত প্রেমিক বলে! তবে শুধু তো প্রেমিক হলেই হবে না। আমি একটু ভদ্দোরলোক চাই। আমি নিজে বেশ দুষ্টু মেয়ে। এই পুরুষগুলো আমার পক্ষেও দুষ্টু, these men were too wicked, even for me. ওরা পাপ করছে ঠিক আছে, কিন্তু ওদের পাপ করার ধরনটাই ছিল ভয়াবহ, there was something horrid and absurd in their way of sinning—they did not only act against conscience, but against nature. সারারাত যা করার তো করল—পরের দিন সকালে ওদের বউগুলো এসে নানা দুঃখের কাহিনি শোনাত, আবার রাত্রে ওই পুরুষগুলো অন্ধকারের



মধ্যে একইরকম মদ খাওয়া, নষ্টামি, ওই একটি উত্তেজনায় সব দুঃখের সমাপন, the same relief again, to drink it away, to debauch it away.

চার

আমার জীবনে নানা পাপের উত্তেজনা। কতরকম অপরাধ করতে-করতে যে শক্ত হতে পেরেছি। শুধু অপরাধ নয়, অভূতপূর্ব সফল অপরাধ। সেটা ছিল ক্রিসমাসের সন্ধে। সারাদিন নানা শয়তানি করেছি। এবার শেষ শয়তানি। ঢুকলাম একটা রুপোর দোকানে। দোকানে কেউ নেই। সামনেই সাজানো থরে-থরে লোভনীয় বস্তু। I saw a tempting bait indeed and the shop had nobody in it. I went boldly in and was just going to lay my hand upon a piece of plate. ঠিক এই সময় রাস্তার একটা হারামি আমাকে দেখতে পেল। হতচ্ছাড়াটা দৌড়ে এসে আমাকে জাপ্টে ধরল। এবং চিৎকার করে সবাইকে ডাকল। বিপদে পড়লে আমার বুদ্ধি খোলে। আমি লোকটার থেকেও চড়া গলায় বলতে লাগলাম, আমি রুপোর চামচ কিনতে ঢুকে প্লেটটা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। লোকটা ক্রমাগত বলতে লাগল, আমি চোর।

পাঁচ

আমি প্রেমের খেলায় কত যে জানি ছল। কিছুতেই ধরা দিই না পুরুষের কাছে। সেই পুরুষই আমি চাই যে বেশি প্রশ্ন করে না। যে বেশি জানতে চায় না। প্রশ্ন করলেই তো মুশকিল, my case would not bear much enquiry. পুরুষ বাছাইতে আমি ওস্তাদ। প্রেম করার ধরন দেখে বুঝতে পারি কে কেমন খেলুড়ে। আমি নানা খেলা খেলি তার সঙ্গে। I try him to the bottom. ওকে একেবারে ওর তলানি পর্যন্ত নিয়ে যাই খেলতে-খেলতে। কোনও-কোনও পুরুষ আমার সঙ্গে প্রেম করে আমার অর্থের জন্য। তারা অবিশ্যি স্বীকার করে না। আমিও তাদের বিশ্বাস করি না। পুরুষটা একদিন এসে আমার জানলার কাচে লিখল তার হিরের আংটি দিয়ে, You I love, and you alone. আমি তার আংটিটা নিয়ে লিখলাম And so in love says everyone. লোকটা এবার লিখল Virtue alone is an estate. আমি লিখলাম, But Money's virtue; gold is Fate. লোকটা রেগে লাল। লিখল I scorn your gold, and yet I love. পুরুষটাকে তখনও বিশ্বাস করিনি। লিখলাম, I'm poor : Let's see how kind you'll prove! তখন ওই খ্যাপা পুরুষটা লিখল Be mine with all your poverty. আমি লিখলাম, Yet secretly you hope I lie. গোপনে এখনও কিন্তু আশা করছ আমি মিথ্যে বলছি, আসলে আমি গরিব নই।

এই বেশ্যা আমার প্রিয় মেয়েদের একজন। তরুণবেলা থেকে আছে আমার সঙ্গে। আমার বয়েস বাড়ছে। ওর যৌবন যাচ্ছে না। ওর ডাক নাম মলি। ভাল নাম মল ফ্ল্যানডার্স। 'রবিনসন ক্রুসো' উপন্যাসের ভুবনখ্যাত লেখক ড্যানিয়েল ডেফো-র 'মল ফ্ল্যানডার্স' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭২২-এ। দু'শো অষ্টআশি বছরেও পুরনো হয়নি ইংরেজি সাহিত্যের এই 'ক্লাসিক।' ম্লান হয়নি মল। অন্তহীন তার ছন্নছাড়া ছেনালি। এতবার পড়েছি উপন্যাসটি, এখনও জানি না মলের ছেলেমেয়ের হিসেব। এবং কার বাপ কে! মলি কি ছাই নিজেও জানে!

মল ফ্ল্যানডার্স ● ড্যানিয়েল ডেফো

মায়ের ভাষা

তখন ক্লাস ফোর টোর-এ পড়ি, মায়ের কাছে জিগ্যেস করতে গিয়েছিলুম," 'মাতৃভাষা নিয়ে' এসে লিখতে দিয়েছেন মিস, কী লিখব, মা?" মা 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ' নিয়ে কিছু কথা বললেন, ভাল বুঝিনি। আমার মনে খটকা রইল, কিন্তু শিশুরা তো বোতলের দুধ, ঝিনুকের দুধ খেয়েও বড় হয়? তবে? মা যা বললেন সেটা ভগবানের বাণীর মতো ছিল আমার কাছে, তাই মায়ের কথামতোই লিখেছিলুম, তবু আমার মনে প্রশ্নটা রয়েই গেল। কেননা আমাদের ইশকুলটা ছিল ইংরেজি মাধ্যমের, তাতে আমাদের বড় হতে তো কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না? তবে? অনেক পরে টের পেয়েছি, ব্যাপারটা আসলে ঘনিষ্ঠতার গল্প। মূলের সঙ্গে যোগাযোগের, মায়ের বুকের সঙ্গে শিশুর ওষ্ঠাধরের সংযোগের গল্প। মায়ের শরীর নির্গত স্নেহের নির্যাস, যার ভাল নাম স্তন্য সুধা, এ শুধুই যে কোনও স্বাস্থ্যকর তরল পানীয় তো নয়? বোতলের দুধ শিশুর শরীরে পুর্তির জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেইটুকুই দেয়। বুঝি বাকি থেকে যায় আরও অনেকখানি উষ্ণতা। মাতৃভাষার কাণ্ডকারখানাও তেমনি, আমাদের চিরাচরিত সংস্কৃতির সঙ্গে গেরো বেঁধে দেয়। অস্তিত্বের শিকড়ের সঙ্গে যোগাযোগের জাদুমন্ত্রটা তো রাজভাষা, রাষ্ট্রভাষা, কি দেবভাষা, কারুরই জানা নেই? সেটি আছে কেবল মায়ের ভাষার মুঠোতে।

বুঝলুম তো সবই, কিন্তু কবরটা কী? বাচ্চাকে ইংরেজি মাধ্যমে না পড়ালে সে তো ভাল কলেজে ঢুকতে পারবে না, চাকরিতে ইন্টারভিউ দিতে সুবিধে করতে পারবে না, তার মাতৃভাষা কি তাকে খাওয়াবে? এই ভুবনায়নের দিনে ওই সব সেন্টিমেন্টাল সিদ্ধান্তে শিশুদের ভবিষ্যৎ বিনষ্ট হয়। না। ও সব দিন বিগত, মাতৃভাষা এখন ঘরের ভাষা, বাইরে চলে না। তার ব্যবহার আটপৌরে, মা ঠাকুমার সঙ্গে বাক্যালাপের ভাষা, আর কাজের লোকজনেদের সঙ্গে সবিনয়ে আদেশ চালাচালির ভাষা। এমনকী আড্ডার ভাষাও আর নেই মাতৃভাষা, বক্তা যদি শহুরে হয় আর বক্তার বয়েস যদি চল্লিশের নীচে হয়। হ্যাঁ, তাদের ক্ষেত্রেও মাতৃভাষা মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে সিন্দুক থেকে, প্রয়োজনমাফিক। কখনও গানে, কখনও কবিতায়। জানে না তা তো নয়, ব্যবহার করার আগ্রহ নেই, উৎসাহ পায় না।

বলতে ভাল লাগে না, শুনতে আরও খারাপ, ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজে একটা শ্রেণিচরিত্র সৃষ্টি হয়েছে, মাতৃভাষাভাষী আর ইংরেজি ভাষাভাষীদের যা আলাদা করে চেনায়। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার সময়ে দেখেছি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা অনুচ্চারিত বিভাজন ছিল, বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়া আর ইংরেজি মাধ্যমের পড়ুয়াদের মধ্যে। পড়ায় ভাল কে বেশি, তার কিন্তু স্থিরতা নেই, দুই দলেই ভাল ছাত্র আর মাঝারি ছাত্র থাকে। তবু মনে হত ক্লাসের বাইরে দুই দলে মিলেমিশে থাকে না। যে যার নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে থাকতে চায়, যার একটি ইংরেজি, আর একটি বাংলা। দেশ ভারতবর্ষ, রাজ্য পশ্চিমবাংলা। কিন্তু বাংলা ভাষার আসন এখানে মোটেই নিষ্কণ্টক নয়। সিংহাসন কেন উচ্চাসনেও সে নেই। কেন এমন হবে? পৃথিবীর আর কোনও উন্নত বা অনুন্নত দেশেও স্বদেশের ভাষা কি এভাবে অপমানিত হয়? কোন দেশে মাতৃভাষা স্বাধীনতার এতকাল বাদে বিপন্ন হয়ে পড়েছে? হতেই পারে, হয়তো আমার জানা নেই। উত্তর ঔপনিবেশিক দেশগুলির কপালে কতরকমের যে রোগ-ভোগ লেখা আছে!

ভাষা শহিদের দিনগুলি

'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি



ভুলিতে পারি?' গফ্ফর ভাইয়ের লেখা এই গান আমাদের যখন পাগল করেছিল তখন ইংরেজি ভাষার কথা কারুর মনেও পড়েনি। আজ ওই তারিখ শুধু বাঙালির নয়, সারা পৃথিবীর মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হয়েছে বাঙালির এই প্রিয় দিন, ভাষা শহিদ দিবস। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের এই রক্তার্ত দিনটি বাঙালি হিসেবে আমাদের কাছে বিশেষ গৌরবের দিন। কিন্তু তারই মধ্যে আমাদের একবার স্মরণ করা দরকার, কাছাড়ে উনিশে মে ১৯৬১ তারিখটির গল্প। যেদিন আমাদের দেশে, এই ভারতবর্ষে, কাছাড়ে ১১ জন মানুষ, তাদের মধ্যে একটি কিশোরী কন্যা অন্য এক মাতৃভাষা আন্দোলনের মিছিলে যোগ দিয়ে, গুলির সামনে প্রাণ দিয়েছিলেন। প্রাণাধিক বাংলা ভাষাকে সংরক্ষণের জন্য শহিদ হয়েছিলেন। পৃথিবীতে ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম নারী শহিদ শিলচরের সেই ইশকুলের ছাত্রী, কিশোরী, কমলা সেনগুপ্ত। কমলাকে কি ভুললে চলবে আমাদের? অসম সরকার ইশকুলে বাংলা ভাষাকে রেখে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, নতুন ভাষা আইন তুলে নিতে হয়েছিল। অনেক বছর পরে আরেকবার আসামে সেই একই চেষ্টা হয়েছিল, আবার বরাকে বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন হয়, আরও একটি দিন ভাষা শহিদ দিবস হয়ে ওঠে। কাছাড়ে, একুশে জুলাই ১৯৮৬কে 'বরাক ভাষা শহিদ দিবস' নাম দেওয়া হয়েছে, সেদিনের আন্দোলনেও পুলিশের গুলিতে দু'জন কিশোর ছাত্রের মৃত্যু ঘটেছিল। শিলচর স্টেশনের নাম পাল্টে 'ভাষা শহিদ স্টেশন' করার চেষ্টা চলছে। সেদিনের মিছিলও ছিল কাছাড়ের পাঠ্যসূচিতে বাংলার বদলে অসমিয়া ভাষাকে চালিয়ে দেওয়ার নতুন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, মাতৃভাষাকে রক্ষার দাবিতে বঙ্গভাষাভাষীদের মরণপণ আন্দোলন। সেই আইন কার্যকর হয়নি।

আমরা বাঙালিরা বোধহয় একটু বেশি মাতৃ দুগ্ধের কাঙাল!

আমি চাইবো, বিশ্বায়নের ঝোড়ো বাতাসে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের আন্তর্জাতিক হাওয়া লেগে আমাদের আপন দেশের



ভাষা আন্দোলনের ছোট ছোট কিন্তু খুব বড় দিনগুলি যেন ভুলে না যাই আমরা। ঢাকার একুশে ফেব্রুয়ারির ছ'জন শহিদের সঙ্গে সঙ্গে এক নিশ্বাসে উনিশে মে-র এগারোজন, আর একুশে জুলাই-এর দু'জনের কথাও যেন আমাদের মনে পড়ে। উনিশে মে আর একুশে জুলাই, এই দু'টি দিনও সর্বত্র বাংলা ভাষাপ্রেমীর কাছে সমান সম্মানে স্মরণীয়। বিশেষত ভারতবর্ষে। বাংলা ভাষার জন্য বাংলাদেশের মাটিতে ছয়জন মানুষের আত্মদানের কাহিনি সবার জানা, কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে বাংলা ভাষার জন্য ১৩জন বাঙালির আত্মবলিদানের কাহিনি এদেশেই বা ক'জন জানেন? বাংলাদেশে কি এই তারিখগুলির কথা কেউ বলেন?

ভুললে চলবে না, ভারতবর্ষের মানুষের তো অনেকগুলি মাতৃভাষা, বাংলাদেশের মতো একটি মাত্র ভাষার নিরাপত্তা আমাদের নেই, তাই মাতৃভাষা প্রেমের গুরুত্বটা আমাদের দেশেই বরং বেশি হওয়ার কথা। বাংলাদেশের চেয়ে একটুও কম নয়।

তবে দিনকাল যেদিকে দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে, আমরা যারা মাটি কামড়ে মাতৃভাষার শ্রীচরণে পড়ে আছি, আমাদের যদি ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয় তা হলে দরকার জরুরি অবস্থা সৃষ্টি করে, আপৎকালীন সচেতনতা নিয়ে ভাল অনুবাদের কাজে লেগে পড়া। বিনা অনুবাদে, নতুন ভুবনের আলোবাতাস না পেয়ে, ভারতীয় সংস্কৃতির এই সনাতন ঐতিহ্য, ভারতের দীর্ঘ দিনের জমে ওঠা ঐশ্বর্য, আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যগুলি একে একে না নিবে যায়। পালি প্রাকৃত পৈশাচীর মতো না হয়ে পড়ে বাংলা মারাঠি তামিল হিন্দি ওড়িয়া। প্রতিকূল বাতাসের সঙ্গে যুঝতে না পেরে আমাদের এই মাতৃভাষা প্রেম পরাস্ত না হয়ে পড়ে একদিন।

আজ খুব তাড়ায় লিখছি, মনের মতো হল না, পরে মাতৃভাষার আয়ুর সংকট নিয়ে আলোচনার ইচ্ছে রইল।

১৩.০২.২০১০

nabaneetadevsen@gmail.com

এবার মলাট ▲ অমিতাভ চৌধুরী

আ মরি

ভাষা বহু দেশ ও কাল পেরিয়ে আসে আমাদের দ্বারে। কিছু ভাষা শান্ত দিঘি, কিছু ভাষা অপার সমুদ্র। মাতৃভাষা বাংলাকে ঘড়ার জল থেকে আন্তর্জাতিক তরঙ্গে রূপ দিয়েছেন বাংলাদেশিরা। এ সম্মানে সম্মানিত সকল বাঙালি।

ভাষার প্রবাসযাত্রা, যাকে বলা হচ্ছে আন্তর্জাতিক হয়ে ওঠা, সে এক বিস্ময়কর পরিণতি। এই জন্য যে, মানুষের আন্তর্জাতিক হওয়া—বাংলায় 'অভিবাসী', ইংরাজিতে 'এনআরআই'—আর, ভাষার আন্তর্জাতিকতা লাভ করা সম্পূর্ণই বিপরীত গুণাবলির পরিচয় দেয়। এবং সেইজন্যই বলি, বিস্ময়কর। যখন কোনও মানুষ বিদ্যাবত্তা, কিংবা বৃত্তিজাত দক্ষতার বলে উচ্চস্বীকৃতির বলয়ে ঢুকতে পারেন, তখনই তাঁর পক্ষে 'এনআরআই' হওয়া সম্ভব। এর ব্যতিক্রম একটা এখন ঘটছে বটে, খনিজ তেলে সমৃদ্ধ চোখ-ঝলসানো বড়লোকদের দেশ—সৌদি আরব, কুয়েত, 'এমিরেট' বলে কথিত আমীরশাসিত জনপদগুলোতে—গতরে-খাটা অদক্ষ শ্রমজীবী আমাদানি করা হচ্ছে হাজারে-হাজারে। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি বিস্তারের কালে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এইরকম প্রচুর ঘটেছিল যে তার প্রমাণ রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কিংবা ফিজি, অথবা পূর্ব আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে। তবু বলতেই হবে, এগুলো ছিল ব্যতিক্রম, এবং আছে-থাকবে ঠিকায় খাটানো শ্রমিক জোগাড়ের নিতান্ত প্রয়োজনীয়-কিন্তু-নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় উপায় হিসেবেই।

অথচ, ভাষার প্রবাস-গমন গোড়া থেকেই ঘটেছে ওই ব্যতিক্রমের পথে। উন্নত, মার্জিত, ব্যাকরণ-সমৃদ্ধ ভাষাই যে বিদেশে আদৃত হয়েছে, তা নয়। প্রকৃতপক্ষে, ভাষা যখন ছিল মানুষের 'বুলি' মাত্র, যখন বর্ণলিপিও তার অঙ্গে ওঠেনি—ব্যাকরণের তো কথাই ওঠে না—তখনই পৃথিবীর আদিম মুসাফিরদের সঙ্গে সে সীমান্তচিহ্নহীন এই ধরিত্রীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছে, কোথায় পাবে একখণ্ড দূর্বাদলশ্যাম, নদীমেখলা উর্বর কৃষিক্ষেত্র তার জন্য। ভাষা-প্রত্নতত্ত্বের বিশেষজ্ঞরা অনেকেই মনে করেন, মানুষের বুলি যখন প্রথাসিদ্ধ, কিন্তু তখনও মূলত ব্যাকরণহীন, কেবল তার স্বল্পাধিক আত্মশৃঙ্খলিত একটি রূপ দেখা দিতে শুরু করেছে, তখন তার প্রসূতিসদনটি তৈরি হয়েছিল একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ব-দ্বীপে। সেটি ছিল টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস নদী দু'টির মধ্যবর্তী একটি অতিশয় উর্বর ভূখণ্ড। তার কারণ ওই ব-দ্বীপটিই মানুষকে শেখায় খাদ্যশস্যের চাষ, এক ঋতুতে বপন, ১২০-১২৫ দিন পরে সেই ফসলটাকে এনে ঘরে তোলা। ফলে গৃহস্থ হওয়া, পশুপালন এবং গরুর দুধ আহরণ করা ইত্যাদি এই বিচিত্র টেকনোলোজি-র জন্মস্থলই মানব সভ্যতার—ভাষাবোধ এবং ব্যাকরণ উন্মেষেরও—প্রসূতিগৃহ হবে তাতে আর আশ্চর্য কী?

(পাঠকের মনে থাকতে পারে, জলশূন্য একটি শুকনো কুয়োর ভিতরে লুকিয়ে থাকা প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে মার্কিন সৈনিকরা পাকড়াও করেছিল। সেই কুয়োটা ছিল প্রায় টাইগ্রিস নদীর পাড়ে।) প্রাক-ব্যাকরণের যুগে, কতকগুলো শিথিল আত্মনিয়ন্ত্রক নিয়মের বন্ধন ভাষাজননী গ্রহণ করলেন ওই বিখ্যাত ব-দ্বীপটিতে। সে জননীকে আমরা বর্ণলিপি দিলাম, কালক্রমে তাঁকে পরালাম ব্যাকরণের বিভূতি। ভাষাবিদরা অনুমান করেন, তাতে মানুষের লেগেছিল কয়েক সহস্রাব্দ। কিন্তু সম্ভবত ওইখানেই আর্য-ভারতীয় (ইন্দো-ইউরোপীয়) ভাষাগোষ্ঠীর মৌলিক উৎপত্তি, অর্থাৎ সংস্কৃত এবং লাতিন ভাষার কোনও অজ্ঞাতনামা মাতামহী ওই শ্যামল ব-দ্বীপটিতে বালিকা হিসেবে খেলা করেছেন। তাঁরই এক পৌত্রী ব্রাহ্মী লিপি এবং সংস্কৃত ভাষার রূপ ও ছন্দ নিয়ে বৈদিক ব্রাহ্মণদের মস্তিষ্কটিকে একেবারে পাগল করে দেন। অপর দুহিতাটি যান উত্তর-পশ্চিমে, নাম হয় তাঁর লাতিন। কিন্তু লক্ষ করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এই দুই রমণীর ব্যাকরণের মৌলিক গঠন একেবারেই স্বতন্ত্র নয়।

যে-কারণে এই প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যে আমার প্রবেশ, সেটি এখন স্বতঃপ্রকাশমান। ওই যে পূর্বমুখী অভিযাত্রায় গঙ্গাতীর পর্যন্ত এলেন সংস্কৃত ভাষার এক জননী—তাঁর দীর্ঘ তীর্থযাত্রা পথটি মনে-মনে মেপে নিন। অন্যদিকে যিনি তীর্থঙ্কর হলেন পশ্চিমে, গেলেন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো পর্যন্ত ভাষা-উপনিবেশ স্থাপন করতে করতে, সেই লাতিনও যে কী প্রকারের আন্তর্জাতিক অভিযানের দুঃসাহস বক্ষে ধারণ করতেন, তা কেবল অনুমানই করা যায়। ওই পথচিহ্নহীন অভিযাত্রায় প্রকৃতির উদ্দাম রুক্ষতার মধ্যে কর্কশ নিশাগুলো কী ভয়ঙ্কর রূপ নিত, কত শ্বাপদসংকুল ছিল পথ, রাতে ক্ষুধার্ত পশুরা রক্তের গন্ধ নাকে নিয়ে কীভাবে ঘুরে বেড়াত তাদের আগুন দিয়ে ঘেরা পরিবৃত্তের চারিদিকে, অন্যদিকে কী তীক্ষ্ণ ক্ষুধায় জর্জরিত হতেন ভাষা-যাত্রীরা, এ-সব আমরা শুধু অনুমানই করতে পারি।

এই ভাষা-তীর্থঙ্করদের আর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদচিহ্ন—বলা যায়—আবিষ্কার করেছেন—মাত্র বছর পঁচিশেক আগে অস্ট্রেলিয়ার ভাষাপ্রত্নতত্ত্ববিদ একটি গোষ্ঠী। তাঁরা সাক্ষ্য-প্রমাণাদি দিয়ে প্রতিপাদন করেছেন যে, টাইগ্রিস ব-দ্বীপে গমভিত্তিক সভ্যতার অঙ্কুর রোপিত হওয়ার অন্তত ৫০০০ বছর আগে, আজ যেখানে শ্যাম উপসাগর রয়েছে, সেখানে ছিল একটি নিম্ন মালভূমি। আজ থেকে পঁচিশ হাজার বছর আগে উত্তর মেরুতে বরফ গলতে থাকার ঘটনাটি প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে বহুভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। এরই একটি রূপকথা-স্বরূপ কাহিনি রয়েছে বাইবেল-এর 'নোয়া'জ বোট' গল্পটিতে। যাই হোক, ওই নিম্ন উচ্চতাসম্পন্ন মালভূমিতেই বিশ্বের আদিমতম মানুষদের একটি প্রজাতি প্রথম ধান থেকে চাল বের করার কৃষিপদ্ধতিটি হস্তগত এবং পরীক্ষিত বাস্তবে পরিণত করে।

নিম্নতল মালভূমিটি ক্রমে-ক্রমে দুই শতাধিক কালের মধ্যে সম্পূর্ণ জলে আবৃত হওয়ার পরে ওইখানে সৃষ্টি হয় শ্যাম উপসাগর। কিন্তু শ্যাম উপসাগরটি সৃষ্টির দুই শতাধিক বৎসর যাবৎ, যত জল বাড়ছিল, ততই ওই মালভূমিতে বসবাসকারী অস্ট্রিক প্রজাতির আদি মানবরা উত্তর দিকে দুই দলে বিভক্ত অভিবাসন যাত্রা শুরু করে। একটি দল যায়, এখন যেখানে ভিয়েতনাম-এর 'রেড রিভার', তার উপকূল অনুসরণ করে উত্তর অভিমুখে। তারাই শেষ পর্যন্ত চিন, জাপান এবং কোরিয়া-র ধান-কৃষিভিত্তিক বসতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

অন্যটি প্রথমে শ্যামদেশ এবং পরে তা অতিক্রম করে নিজেদের কৃষিযোগ্য জমি অন্বেষণের এবং বসতি স্থাপনের অভিযানকে নিয়ে আসে ব্রহ্মদেশে। ক্রমে সেখানে থেকে মণিপুরে এবং আরও পরে আসাম অতিক্রম করে তারা এসে দাঁড়ায় একেবারে গঙ্গা-পদ্মা বিধৌত বঙ্গদেশজ অধিত্যকায়।

লোকগাথা এবং লোকমুখে-পল্লবিত গল্পগুলোকে নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার পদ্ধতিকে আজকাল একটি বিজ্ঞানসম্মত সমাজতত্ত্বের উপাদান হিসেবে স্বীকার করা হয়, অনেক বিদ্বৎমণ্ডলীতে। ওই দৃষ্টিতে দেখলে আমরা বাঙালিরা প্রধানত অনার্য, মূলত অস্ট্রিক, কিন্তু মঙ্গোলদের চিনা রক্তেরও বিশেষ অংশ-সংস্পর্শ যুক্ত। আমাদের নৃতাত্ত্বিক গঠন প্রায় সর্বাংশেই শ্যামদেশীয়দের ন্যায়। এবং সেই অনুপাতেই আর্যরক্ত-বিমুক্তও।

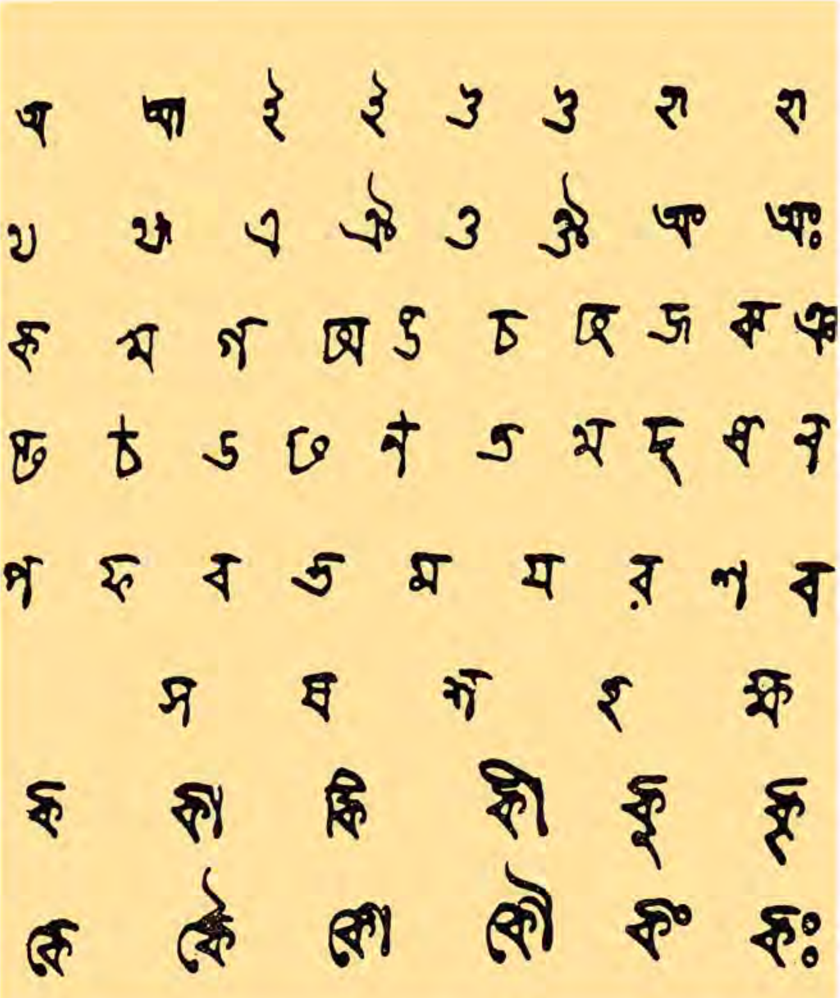
সে একটা অন্য প্রসঙ্গ। আমি আবেগবশত তাতে প্রবেশ করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। বলছিলাম, ভাষার জন্মলগ্নে তিনি আশ্চর্যভাবে ছিলেন তীর্থঙ্কর এবং সেই অর্থে আন্তর্জাতিকও। এছাড়া ভাষাজননী যে আন্তর্জাতিক হন, যখন হন, তার অন্য অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির প্রসার, আবার উল্টো দিকে, শুভদূত হয়ে আসা ভাষা, ডালি ভরে যখন নিয়ে আসে কোনও একটা নবজাত বিজ্ঞান বা প্রকরণকলা, অথবা মতাদর্শ, তখন দেখবেন, সে সম্পূর্ণই এসেছে কল্যাণের বাহক হয়ে। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির বাহক, স্প্যানিশ এবং ফ্রেঞ্চ এই ভূমিকা নিয়ে প্রকাণ্ড আন্তর্জাতিক যাত্রা শুরু করলেও ইংরেজির সঙ্গে পাল্লা দিতে না-পেরে, এখন দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণির পাঙ্ক্তিবাহক হয়ে পড়েছে, এবং বিশ্বের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভৌগোলিক বলয়ে তাদের আন্তর্জাতিকতারও দাপট সীমাবদ্ধ এবং বিলীয়মান।

এই শ্রেণির একেবারে প্রাচীনতম দৃষ্টান্তটি বিশ্বে স্থাপন করে বৌদ্ধধর্মের দ্বারা জনপ্রিয় হওয়া—এবং কঠিন ব্যাকরণের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেওয়া ভাষা—'পালি'। প্রাচীন পৃথিবীতে —একদিকে আফগানিস্তান, অন্যদিকে কোরিয়া-জাপান পর্যন্ত সে যে তার বিজয়কেতন উড়িয়েছিল, তার কারণ সে ছিল জনশিক্ষার বাহক, সেই অর্থে গণমুক্তিরও।

অতঃপর স্প্যানিশ, তার কনিষ্ঠ ফ্রেঞ্চ এবং অবশেষে ইংরেজি হল আমাদের—বলতে গেলে সকলেরই—গুরুত্ববহ, অবশ্য শিক্ষণীয়, 'সেকেন্ড ল্যাংগুয়েজ'। কলকাতায় তো দেখছি, বাংলাদেশের বিপরীত, সে প্রথমা হওয়ার চেষ্টায় প্রায় সার্থক হয়ে উঠল। এটার পিছনে যে-সব চালিকাশক্তি কাজ করছে, সে বিজ্ঞান নয়, কোনও মতাদর্শও নয়, বিশুদ্ধ চাকরি ধরার বাসনা।

তৎসত্ত্বেও এই দুঃসহ অপমানকর অন্তর্জ্বালা সরিয়ে রেখে সম্প্রতি আন্তর্জাতিকতার মুকুট পরতে পেরেছেন আমাদের বাংলা ভাষাজননী। সে কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গবাসী, মায়ের গর্বে আত্মহারা মানুষদের জন্য। তারা একদল ছাত্র, ১৯৫২ সালে উর্দুভাষীদের





বিরুদ্ধে স্বাধীনতার মহান অভিযানে অবতীর্ণ হয়ে ঢাকার রাস্তা রক্তে ভিজিয়ে দিয়েছিল। ওই বাঙালিরাই আর চারজন ক্ষুদিরাম তৈরি করল, তাদের জন্য গানে-গানে আকাশ গেল ভরে। রবি ঠাকুর পুনর্জন্ম পেলেন। বাংলা অক্ষরে লেখা 'বিমান' উড়ল ৩২ হাজার ফিট ওপরে, আবহমণ্ডল ছাড়িয়ে। এবং একটি-দু'টি মহাসমুদ্রও পার হতে লাগল প্রতিদিন। বাংলা ভাষার ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে—এক অর্থে চিহ্নিত করা যায়—বৃহত্তম আন্তর্জাতিকতার দূত হিসেবে। তিনি হয়তো উপলব্ধি করেননি, বাঙালিকে স্বাধীন করা মানে তাকে এবং অবশ্যম্ভাবী রূপে তাঁর মাতৃভাষাকেও আন্তর্জাতিক জয়যাত্রায় পাঠানো।

অন্যত্র, যেমন ধরুন অদ্যকার ভারতবর্ষে, ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে খণ্ডন এবং উপজাতীয়তার প্রকারভেদ আবিষ্কারের ভ্রান্ত এবং ভয়ঙ্কর ছলনা।

এরই বিপরীত মেরুবিন্দুতে দেখুন, বাঙালদেশি ভাইদের শ্রদ্ধায় আদরে নিত্য-আরাধ্য বাংলা মা হয়েছেন সকল প্রকার মুক্তমনা আন্তর্জাতিকতার দূত। যৌবনেরও দূত। এখন নিউ ইয়র্ক সংলগ্ন জেলা (বা কাউন্টি যাকে বলে আমেরিকানরা।)—সেখান থেকে পৃষ্ঠাসংখ্যায় সমৃদ্ধ (৮০ থেকে ১০০) ২৫-৩০টি চমৎকার, সারগর্ভ বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ বেরিয়ে সারা মার্কিন জগতে বাংলার জয়গান ধ্বনিয়ে তোলে। এই আন্তর্জাতিকতা যে আমাদের ভাষাজননী অর্জন করলেন—তা সত্যকার ধর্মনিরপেক্ষ, এবং সাংস্কৃতিক স্বভাবে উচ্চমনা এক বাঙালি জাতির নবজন্মের ফলেই। তার জন্য কালক্রমে আমাদের বিশ্বব্যাপী গৌরব বাড়তেই থাকবে। ওই স্বপ্নেরই দূত রবীন্দ্রনাথ নেই মায়ের আরতির জন্য। কিন্তু হল সবই তাঁর বাণী অন্তরে নিয়ে, তাঁর গান গাইতে গাইতে।


পূর্বভারতের সর্ববৃহৎ ডায়াবেটিস এবং মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল
সমস্ত রোগমুক্তির নতুন ঠিকানা
প্রতিশ্রুতি বিশ্বমানের পরিষেবা
একই ছাদের নীচে সব রোগের নিরাময়
যে-কোনো অসুখে, ১০০ টাকায়
বিশেষজ্ঞদের বিশদ পরামর্শ
(সকাল ৮ থেকে দুপুর ২)
সেরা সি. টি. অ্যাঞ্জিও মেশিনের সার্বিক
সুবিধাযুক্ত অত্যাধুনিক প্যাথোলজি
(রিপোর্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে)
দিনরাত অবিরত ইমারজেন্সি, সবসময় ফার্মাসি
স্পেশালিটি ক্লিনিক্স- ডায়াবেটিস, হার্ট, অ্যাজমা,
চক্ষু পরীক্ষা সহ সামগ্রিক চিকিৎসা
রেডিয়োলজি, ইমেজিং পরিসেবা, সি টি স্ক্যান
কালার ডপলার, এম আর আই সহ
আধুনিক ক্ষ্যাবরেটরির পরিষেবা
কর্পোরেট, সিনিয়র সিটিজেন এবং
সন্নিহিত প্রতিবেশীদের জন্য বিশেষ সুবিধা
অঙ্গীকার সেবার আদর্শ, কম খরচে ভালো চিকিৎসা।
Care for Life
আপনার সুস্বাস্থ্য
আমাদের অঙ্গীকার
জি ডি ডায়াবেটিস ইনস্টিটিউট অ্যান্ড স্পেশালিটি ক্লিনিক্স প্রা. লি.
১৫০ শয্যা এবং বহুমুখী পরিষেবা বিশিষ্ট অত্যাধুনিক হাসপাতাল
১৩৯এ লেনিন সরণি, কলকাতা ৭০০ ০১৩ ফোনঃ ০৩৩-২২২৫৫০৩০/৩১/৩২/৩৩
ফ্যাক্সঃ ০৩৩-২২২৫১১১৫ E-mail: gddi502@gmail.com, gddi502@bsnl.com

সব ভাষা ঘরে ফেরে

ভাষা যায় এক মুখ থেকে আরেক কানে। মধ্যিখানে তার দালালি খায় ভদ্দরলোক। কখনও তার নাম বুদ্ধিজীবী, কখনও ক্যাডার।

ভাষা বদলে যায়
বদলে দেওয়া হয়
একদলের ভাষা অন্যদল বদলে দেয়

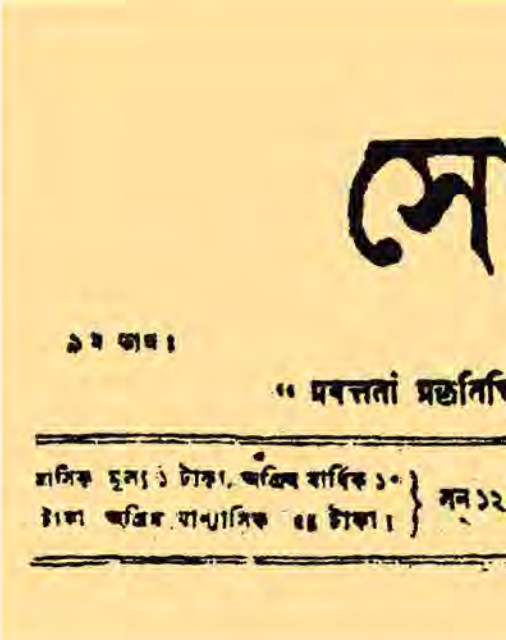
বেশ কয়েক বছর আগের কথা। খাদ্যের অধিকার চালু হয়েছে, ঠিক মনে নেই। সরকারের সব কাজের যা হাল : ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা, কাজের বেলায় লবডঙ্কা। আমরা, যাদের সব ব্যাপারে নাক গলানোর ব্যারাম, একটা জনশুনানির আয়োজন করলাম। নাকে ঢুকেছে গ্রাম মফঃস্বলের লোকজন ডেকে এনেছে, তাদের কথা শুনে নিয়ে, নামকরা লোকেদের শুনিয়ে দিয়ে, সেই নামকরিয়ে লোকেদের দিয়ে সেইসব কথা লিখিয়ে নিয়ে, সরকারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে জানিয়ে দেওয়া কিচ্ছুটি হচ্ছে না। একটি বাক্যে লিখলাম বটে, কমা বসিয়ে কাটলাম যদিও, কাজের বেলায় অনেক হ্যাপা পোয়ানো।

জনশুনানির দিন এগ্রাম ওগ্রাম যেগ্রাম থেকে লোক আনার হিম্মৎ ছিল আনা হল কলকাতায়। জনশুনানির ঘরের মাঠে। এবার এক একটা লোকদল এক একজন ভলানটিয়ারকে বলে যাচ্ছেন তাঁদের বলার কথা শোনানোর কথা। কী পাচ্ছেন না, কেন পাচ্ছেন, পেতে গিয়ে কী করেছেন, পাওয়ায় কারা আটকাচ্ছেন। তাঁদের রাগ অনুনয় অসহায়তা যন্ত্রণা হতাশা পরিশ্রম চেষ্টা ব্যর্থতা অপমান বঞ্চনা অবহেলা এমন সব সবকিছু তাঁদের ভাষায় চলে আসছিল চলে চলে আসছিল। সমস্যা ভলানটিয়ারদের। তাদের হাতে জনশুনানির উদ্যোক্তাদের বানানো সাদা কাগজ, কাগজে ছাপানো প্রশ্ন, আগে থেকে ঠিক করে রাখা প্রশ্ন, এই প্রশ্নের কী কী উত্তর হতে পারে, উত্তর ধরাবার কতটা জায়গা লাগতে পারে লাগা দরকার আগে থেকে আন্দাজ করে নিয়ে প্রশ্নের তলায় সাদা খালি খালি জায়গা। এবার মস্তানি ভলানটিয়ারদের। গেঁয়ো মানুষদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে গড়িয়ে উপচিয়ে পড়া কথাকে কথাদেরকে কথার ভাষাদেরকে হাতে ধরা কাগজে ছাপা প্রশ্নের উত্তর করে নেওয়া। কোন প্রশ্নের কোনটা উত্তর কেটে কেটে নেওয়া। উত্তরের জন্য রাখা খালি খালি জায়গার খোপে ঢুকিয়ে দেওয়া। মানুষের মনের কথার ভাষা, সংগঠকদের দরকারি সাংগঠনিক ভাষা হয়ে যাচ্ছে। গেঁয়ো ভাষাকে ভেঙেচুরে দুমরিয়ে মুচড়িয়ে এপাশ ওপাশ করে ইয়ে মেরে দিয়ে শহরভাষা করে দেওয়া হল। আমাদের বেহালার আড্ডার ভাষায় একশো আটবার করে দেওয়া হল। খাবার পেতে চাওয়া মানুষের বঞ্চনা অভিমান রাগ আশা সব ভলানটিয়ারদের বয়ানে অভিযোগের ভাষা বানিয়ে দেওয়া হল। এইবার সেই সব প্রশ্ন উত্তর দিয়ে বানানো অভিযোগপত্র জনশুনানির বিচারকদের হাতে হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল। অভিযোগকারীদের ডাকা হল, তাদের আবার প্রশ্ন করা হল, তাঁরা আবার আগের মতো, তাঁদের মতো করে তাঁদের কথা শোনালেন। সেই সব কথা বিচারকদের কানে ঢুকে মাথার মোড় ঘুরে হাতের কলমে এসে বিচারকদের বয়ান হয়ে সামনের কাগজে আর এক ভাষা হয়ে গেল। রানিং শর্ট নোট। সব শেষে সেই সব নোট আর ভলানটিয়ারদের বানানো সামারি দিয়ে তৈরি হল জনশুনানির প্রতিবেদন। প্রতিবেদনের ভাষা। সরকারের জন্য।

সরকারের কান দিয়ে ঢুকিয়ে মগজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কান যেহেতু সরকারের, সেই কানে ঢোকে শুধু প্রশাসনিক ভাষা। মাথা যখন সরকারের, সেই মাথায় যায় শুধু আইনি ভাষা। অতএব তাই করা। গাঁয়ের মানুষের কথার ভাষা, সংগঠকদের সাংগঠনিক ভাষা হয়ে সরকারের কাছে প্রশাসনিক ভাষা হয়ে পৌঁছে গেল, পৌঁছে দেওয়া হল। সাইজ করে খাপের খোপে ঢুকিয়ে দেওয়া গেল।

ব্যাপারটি যখন মাথায় সেঁধিয়েছিল একবার খোলসা করেছিলাম আর একটা জনশুনানির কথায়। সংগঠনের চোখ রাঙা হয়েছিল : কোনটা দরকার কমরেড। ঠিকঠাক পেটে খাবার ফেলা নাকি ঠিকঠাক ভাষার মাল নাবানো। জবাবটা প্যান্টের পিছনপকেট হাতড়ে তখন পাইনি, এখনও জামার বুকপকেটে নেই।

একদলের ভাষা
অন্যদল বদলে দেয়



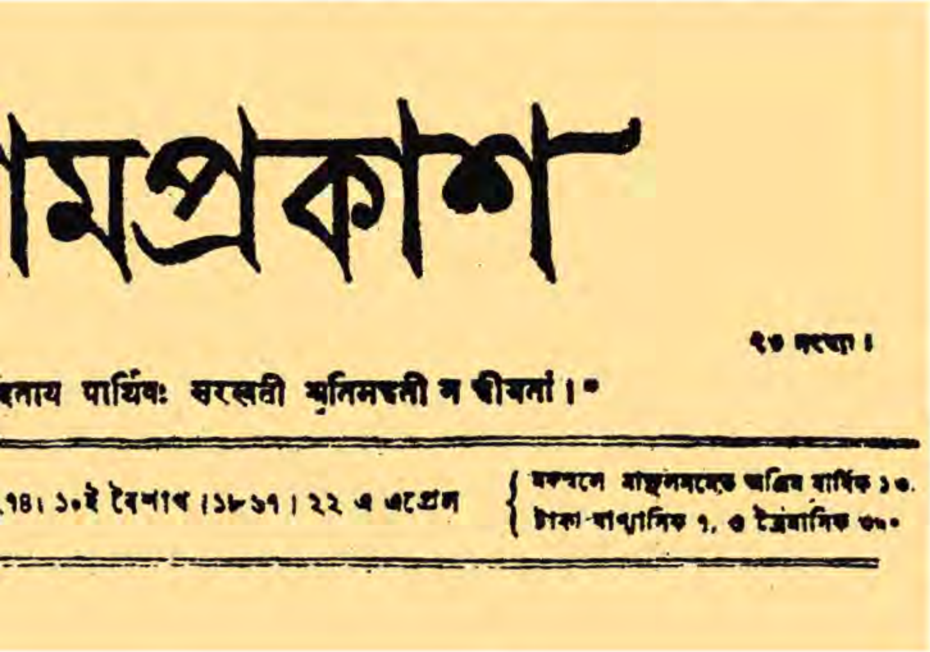
একদলের ভাষা একদল নিজেরাই বদলে দেয়
অন্যদের জন্য

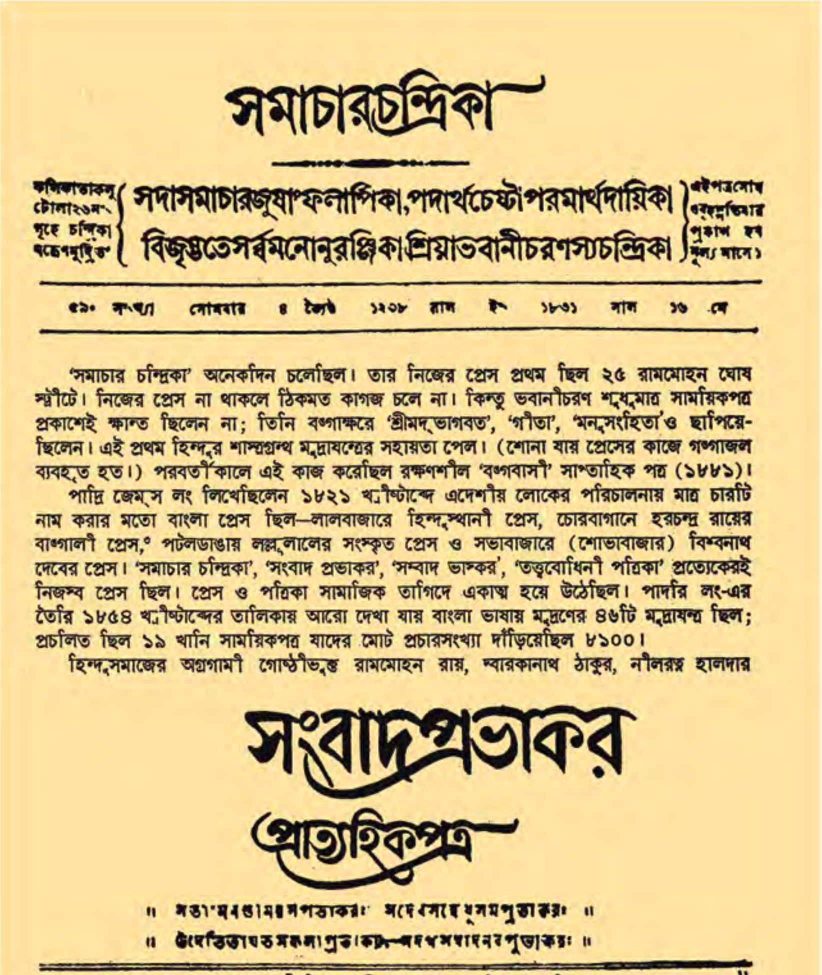
উত্তর বাংলার কোদাল বস্তি। বনবস্তি। বনবাসীরা অরণ্য অধিকার কাজে লাগানোর আন্দোলনে। বনদপ্তর কাজে লাগাতে দিচ্ছে না। বনবাসীরা সংগ্রামে। সংগ্রামে জুড়ে আছে আমার বন্ধুরা অনেকদিন। ওরা বলল তাই হাজির আমিও। কোদাল বস্তির মাঠে আমাদের জড়ো হওয়া। কোদাল বস্তির বনবাসীরা আদিবাসী। রাভা। ভাষা রাভা। আমি আমার সংগঠক বন্ধু বাংলাভাষা। আমাদের মধ্যে কথার আসা যাওয়া। রাভাদের কথা রাভা ভাষা থেকে রাভারা বাংলাভাষা করছেন। আমাদের কথা বাংলাভাষায়। আমাদের বাংলাভাষা কথা রাভাদের বাংলাভাষা হয়ে রাভাভাষা হয়ে যাচ্ছে। রাভারা করছেন। সবাই নয়। সেই দু-তিনজন যাঁরা রাভা আদিবাসীদের কথা বাংলাকে জানাতে বাংলায় জানাতে পারেন, জানাতে পারায় আছেন। আমি বাংলায় রাভাদের কথা জেনে নিতে রাভাদের ভাষা জানি না, জানতে চাই না। আমি কে হে বোকচন্দর। ওভাবে খিস্তি করে লাভ নেই। আমিই সেই বস্ যাকে সবাই জানাবে, জানতে চাইবে, জানাতে বাধ্য আমার ভাষায়। আমি সেই মধ্যস্বত্বভোগী ইতিহাসপুত্র এবং চল পানসি কমলাপুর বেয়ে এখন মধ্যস্থতাভোগী। আমি কথা বানিয়ে দিই, বলিয়ে দিই। ভাষার দালালি করি। ভাষার মধ্যস্থতা। রাভাভাষী রাভাবনবাসীদের অরণ্য অধিকারের রাভা ভাষাকে আমার বাংলায়, ইংরেজি বাংলায় নিয়ে এসে প্রশাসনের কাছে বাংলা ইংরেজিতে পৌঁছে দিই। মধ্যস্থতা করি। আমি ট্রেডইউনিয়ন, ট্রেডইউনিয়নের ভাষা, ভাষার ট্রেডইউনিয়ন। আমিই এনজিও, এনজিও ভাষা ভাষার এনজিও। আমিই বুদ্ধিজীবী, বুদ্ধিজীবীর ভাষা আমিই প্রগতিশীল, প্রগতিশীলতার ভাষা, আমিই পার্টি, পার্টির ভাষা, আমি মাঝখানে। একদিকে নিম্নবর্গ, নিম্নবর্গের ভাষা, লোকভাষা। অন্যদিকে উচ্চবর্গ প্রশাসন, উচ্চবর্গের ভাষা, প্রশাসনের ভাষা। আমি মাঝখানে, ক্ষমতার গাঁজাটানা শিবঠাকুর, মাঝখানের ভাষা, মধ্যস্বত্বভোগীর ভাষা, মধ্যস্থতার ভাষা, আমার ক্ষমতার ভাষা, করে খাওয়ার ভাষা, দালালির ভাষা, আমার যৌবনভূমির উচ্চারণে হারামিপনার ভাষা।

চটকল আন্দোলনের খুব বড় এক নেতার সঙ্গে আড্ডা মারছিলাম। অনেককাল আগের কথা। আমাদের কথাকথির মাঝখানে খানে ছোট নেতারা আসছিলেন, শ্রমিকরাও, এটা ওটা সেটা বলছিলেন, জেনে নিচ্ছিলেন, শুনছিলেন, ঘাড় নাড়ছিলেন, নাড়াচ্ছিলেন না। অনেকক্ষণ ধরে ছক কষছিলাম, চান্স পেয়ে সাঁ করে নামিয়েছিলাম। যা সব করতে বলছিলেন ওদের শিখিয়ে দেন না কেন, তা হলে আর সব বিষয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হয় না। ওটা হয় না কমরেড, ওদের সব শিখিয়ে দিলে আমার কী হবে, না ঘামানো মাথাটার কি হবে। মালটা এমন ঝাকসে নাববে রেডি ছিলাম না।

উপনিবেশ ইতিহাসের কাছে আমাদের ঋণ শোধ হয়নি।
একদল নিজেদের ভাষা
নিজেরাই বদলে নিই
অন্যের জন্যে নয়
নিজের জন্যই

আমরা কলকাতায় আসা, আসতে বাধ্য হওয়া, থাকতে হবেই বাঙালরা বাঙাল পাড়ায় থাকি। বাড়িতে পাড়ায় বাঙাল কথা বলি। নিজেদের ভাষা বলি। আমাদের ঘটি ইস্কুলে পড়তে যেতে হয়, ঘটি পাড়া দিয়ে, ঘটি বন্ধুদের সঙ্গে। আমরা বাঙাল বলে বাঙালভাষায় বলি বলে আমাদেরকে ঠাট্টা খ্যাপানো তাচ্ছিল্য অপমান। ভাষাকে। আমাদের বাঙাল ছেলেদের বাঙাল গোঁ ধরিয়ে দেওয়া হল। পড়াশোনা কর, লেখাপুড়া কর, ওগো দ্যাখায় দে। আমরা দেখিয়ে দিতে চাইলাম ইস্কুলে, কলেজে,





সমাচারচন্দ্রিকা

কলিকাতাকলু টোলা২৩নং গৃহে চন্দ্রিকা যন্ত্রেণমুদ্রিত { সদাসমাচারজুষাংফলাপিকা,পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা বিজৃম্ভতেসর্ব্বমনোনুরঞ্জিকাশ্রিয়াভবানীচরণস্যচন্দ্রিকা } এইপত্রসোম বৃহস্পতিবার প্রকাশ হয় মূল্য মাসে ১

৫৯০ সংখ্যা সোমবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ সাল ইং ১৮৩১ সাল ১৬ মে

'সমাচার চন্দ্রিকা' অনেকদিন চলেছিল। তার নিজের প্রেস প্রথম ছিল ২৫ রামমোহন ঘোষ স্ট্রীটে। নিজের প্রেস না থাকলে ঠিকমত কাগজ চলে না। কিন্তু ভবানীচরণ শুধুমাত্র সাময়িকপত্র প্রকাশেই ক্ষান্ত ছিলেন না; তিনি বঙ্গাক্ষরে 'শ্রীমদ্‌ভাগবত', 'গীতা', 'মনুসংহিতা'ও ছাপিয়েছিলেন। এই প্রথম হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা পেল। (শোনা যায় প্রেসের কাজে গঙ্গাজল ব্যবহৃত হত।) পরবর্তীকালে এই কাজ করেছিল রক্ষণশীল 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক পত্র (১৮৮১)।

পাদ্রি জেম্‌স লং লিখেছিলেন ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে এদেশীয় লোকের পরিচালনায় মাত্র চারটি নাম করার মতো বাংলা প্রেস ছিল—লালবাজারে হিন্দুস্থানী প্রেস, চোরবাগানে হরচন্দ্র রায়ের বাঙ্গালী প্রেস,° পটলডাঙায় লল্লুলালের সংস্কৃত প্রেস ও সভাবাজারে (শোভাবাজার) বিশ্বনাথ দেবের প্রেস। 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'সংবাদ প্রভাকর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রত্যেকেরই নিজস্ব প্রেস ছিল। প্রেস ও পত্রিকা সামাজিক তাগিদে একাত্ম হয়ে উঠেছিল। পাদরি লং-এর তৈরি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের তালিকায় আরো দেখা যায় বাংলা ভাষায় মুদ্রণের ৪৬টি মুদ্রাযন্ত্র ছিল; প্রচলিত ছিল ১৯ খানি সাময়িকপত্র যাদের মোট প্রচারসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৮১০০।

হিন্দুসমাজের অগ্রগামী গোষ্ঠীভুক্ত রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, নীলরত্ন হালদার

সংবাদপ্রভাকর

প্রাত্যহিকপত্র

ইউনিভার্সিটিতে, চাকরিতে, আমরাও পারি, আমরাও জানি বাংলাভাষা, কলকাতার ভাষা, তোমাদের ভাষা, ক্ষমতার ভাষা, তোমাদেরই মতন পারি। হালায় আমাগো লাইগ্যা পোঙা মারতে আসস না। তোদের ভাষা দখল। আমাদের ভাষা বদলে দিয়ে, ছেড়ে দিয়ে, হারিয়ে ফেলে।

ভাষা বদলে দিচ্ছি
বদলে নিচ্ছি
হারিয়ে ফেলছি
ফিরিয়ে আনছি
ফিরে আসছি

আমাদের ছোটবেলা খচরামি ভাষা। আমাদের বড়বেলায় বদলে ফেলে ভদ্দরলোকের ভাষা। লেখাপড়া চাকরি সংসার ভদ্দরলোকের ভাষায়। অন্যলোক ভাষায়।

কখনও কোনসময় দত্তদার দোকানে ফিরে যাওয়া, পুকুরপাড়ে

শ্রীশ্রীপরমেশ্বরো জয়তি।

এতদ্দেশি বিষয়ি লোকেরা স্বকীয় ভাষার শুদ্ধরূপে লিখনে ও শব্দার্থবোধে ও নানা দেশীয় বিবরণ জ্ঞানে প্রায় অনেকে অপটু ছিলেন। তাহার কারণ এই যে সংস্কৃতে অসংস্কৃত লোকের দিগের শুদ্ধ লিখন ও শব্দার্থবোধ দুর্ঘট এবং বালক কালাবধি স্বং শিক্ষকের নিকট শুদ্ধ লিখন পঠনাদি হইলেও তৎসংস্কার বশতঃ লোকেরা শুদ্ধ লিখনাদি ক্ষম হইতে পারেন পূর্ব্বে তাহাও অত্যল্প ছিল এবং বঙ্গ ভাষাতে দেশ বিভাগ বিবরণার্থে কোন পুস্তক ও রচিত ছিল না সুতরাং এতদ্দেশীয়েরা শুদ্ধ লিখন ও শব্দার্থবোধ ও অন্য দেশবৃত্তান্ত জ্ঞানে অপটু প্রায় এবং জন্মান্ধ সদৃশ হইয়া অর্থকরী কিঞ্চিদ্বিদ্যোপার্জ্জন দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া কাল ক্ষেপ করিতেন।

এবং এতদ্দেশীয় পণ্ডিত কর্ত্তৃক শুদ্ধীকৃত মুদ্রিত পুস্তক ও প্রচলিত ছিল না যে তত্তমুদ্রিত পুস্তক বর্ণানুসারে তাঁহারা শুদ্ধ লিখনাদিতে ক্ষমতাপন্ন হয়েন। পরে শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডীয় লোকেরা মুদ্রিত পুস্তকের প্রচার করিলে ও এতদ্দেশীয়েরা তৎপথপ্রবৃত্ত হইয়া কামসংবর্দ্ধক নানাবিধ রতিমঞ্জরী বিদ্যাসুন্দর কামশাস্ত্র প্রচার করিয়া বালকের-

রাস্তার ধারে বাঁশের মাচায় পাজামা খালি গা গরমকাল গায়ের ঘাম গামছা দিয়ে মোছা হিড়িক মারায় পৌঁছে যাওয়া নিজেদের ভাষায় ফিরে যাওয়া, ফিরে পাওয়ার আনন্দে ফিরে যাওয়া, নিজেকে পাওয়ার।

আমাদের বাংলায় বোঝানো মিটিং শেষ হয়ে গেল রাভা যৌবন নিজেদের কথায় ফিরে চলেন নিজেদের মধ্যে নিজেদের জন্য। সন্ধে হয়ে আসা কোদাল বস্তির মাঠে নিজেদের ভাষাকে ফিরিয়ে আনলেন।

জঙ্গলে তখন পাখিরা ফিরছেন।

সব ভাষা ঘরে ফেরে, সব আদিভাষা, সব আদিবাসী। কোন শালার ক্ষমতা নেই তাকে আটকায়। কোনও চিদু, কোনও বুদ্ধ, গ্রেহাউন্ড কোবরা, কোনও গ্রিনহান্টার, কোনও হালার ভাষাশিকারির খ্যামতা নেই তাকে রুখে দেয়।

মাতৃভাষা ▲ জয়া মিত্র

নারীভাষা

বাংলা ভাষার অনেক মণিমুক্তোই নারীর নিজস্ব ভুবন বহন করে। আর তার চেয়েও বেশি শব্দ নারীকে উঠতে-বসতে মনে করিয়ে দেয়, সে ক্ষমতাহীন, শাসিতা।

প্রেসিডেন্সি জেলে আমাদের সঙ্গে ছিল এক নিভা। আমরা চারজন দোতলার সেলে বন্ধ থাকি। আন্ডার ট্রায়াল বন্দিদের চব্বিশ ঘণ্টা বন্ধ করে রাখা 'জেল কোড'-এ বারণ বটে কিন্তু জেলের কর্তারা আমাদের তা-ই রাখতেন, চব্বিশ ঘণ্টা সলিটারি কনফাইনমেন্ট। তাই আমাদের খাবার এনে দেওয়া, ওয়ার্ডারকে কোনও প্রয়োজনের কথা জানানো—ইত্যাদি কাজের জন্য নিভাকে আমাদের কাছে আসতে দেওয়া হত। নিভা পাগল হয়ে রাস্তায় ঘুরছিল, পুলিশ ওকে ধরে জেলে রেখেছিল। আমরা যখন নিভাকে দেখেছি তখন নিভা ভাল হয়ে গিয়েছে। কুচকুচে কালো মুখখানা ঘিরে থুপিথুপি চুলের ডালা। উজ্জ্বল লাল টিপ পরা কপাল। সবচেয়ে সুন্দর ছিল ওর হাসিভরা মুখের অবিশ্রান্ত ছড়া কাটা। কোনওদিন হয়তো ঘরে ফেলে আসা ছেলের জন্য মন একটু ভার। হাসছে না, কথা বলছে না। বলেছি, ও নিভা, আজ মুখ কালো করে আছিস কেন? কী হয়েছে? অমনি নিভা একগাল হেসে ঝরঝর করে বলে উঠবে।

অতি ভাল কাপড় কালো পাকা পিয়ারা
তোর জন্যি ভেবে ভেবে মোর এই চিয়ারা

অর্থাৎ কিনা চেহারা। তো, ওর সেই অজস্র ছড়ার মধ্যে থেকে একটা ছড়ার কথা প্রায়ই মনে পড়ত।

কচি কচি পেয়ারা পাতা/ও ঠাকুমা যাচ্ছ কোথা
আমি যাচ্ছি কলকাতা/এনে দিও কাজললতা
এনে ফেলেছি ঢাকাই শাড়ি/এ কি আমি পরতে পারি!
দাদার বউয়ের যেমন গুণ/তরকারিতে দেয় না নুন

একটা প্রসঙ্গ চলতে-চলতে হঠাৎ 'দাদার বউয়ের' গুণপনাটা এমন দুম করে এসে পড়ে যে শুনে সেই আকস্মিকতায় হেসে ফেলাটা ছিল অনিবার্য। পরে ধীরে-ধীরে মনে হয়েছে ভাষার মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়েই বোধহয় রয়ে গিয়েছে এইসব দাদার বউ কাকার ঝি শাশুড়ি কি বেয়ানের ব্যাখ্যান। বাংলা ভাষার এ এক নিজস্ব, সময় সময় রহস্যময় অথচ আচরিত প্রাঙ্গণ, যদিও ছড়া প্রবাদ ধাঁধা রহস্যের এই বর্ণিকা ভুবনের অনেকখানিই আজ অপ্রচল প্রচ্ছন্নে মুখ লুকিয়েছে। এই সমস্ত জগতটির স্রষ্টা মেয়েরা, ব্যবহারকারীও মেয়েরা এবং উচ্ছিষ্টও বেশিরভাগ সময়েও মেয়েরাই। বৈঠকখানা কি সদরের ভাষার বাইরে, অনেক বেশি খাঁজভাঁজের ব্যঞ্জনাময় এই মেয়েদের সম্পর্কিত ভাষার জগৎ। এখানে যেমন বাড়ির বউয়ের উক্তি শোনা যায়, স্নান খাওয়া সেরে নিশ্চিন্তে হাত ধোয়ার সময় তার হঠাৎ মনে পড়ে স্নানের সময়ে ননদকে কুমিরে ধরেছিল, সেই কথা—

ভাল কথা মনে হইল আঁচাইতে আঁচাইতে
ঠাকুরঝিরে লয়্যা গেল নাচাইতে নাচাইতে

জলের ভিতরে তোমাগো নি কুটুম আছে? এই 'জলের ভিতর কুটুম' থাকা সম্পর্কে যে স্বর্গীয় সরলতাময় কৌতূহল প্রকাশ পায় সেই শয়তানির তুলনা নেই। আবার ওই ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা তৈরির পিছনে থাকে যে গল্প তারও আভাস প্রচুর। মেয়ের শাশুড়ি মৃত্যুশয্যায় দেখে মেয়ের মা উল্লসিত। তিনি বলছেন মেয়ের আশু স্বস্তির কথা,

একলা ঘরের গিন্নি আমার মা গো
লাপুর লুপুর খাবে আমার মা গো

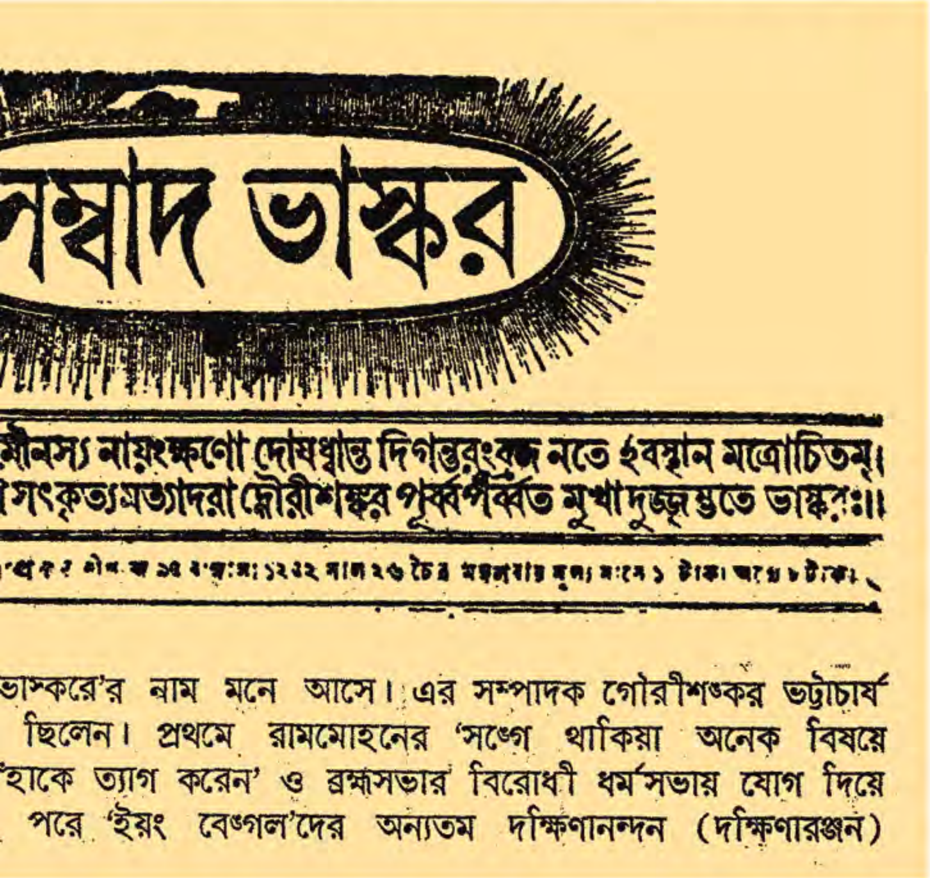

‘প্রভাকরে’র সঙেগ ‘সম্বাদ
(‘গ্ড়গ্ড়ে’) খ্ব চতুর লোক
তাঁহাকে সাহায্য করিয়া তিনি
নন্দলাল ঠাকুরের অন্গত হন।

কণ্ঠাগতপ্রাণ শাশুড়ি সতর্ক করছেন,

এখন থেকেই গোল কোরো না,
নড়ছে আমার পা গো!

এমন অজস্র। এইসব ঠাট্টা-তামাশার মধ্যে দিয়ে ঝলক দিয়ে যায় একটি স্পষ্ট ছবি—ক্ষমতার হাতে ক্ষমতাহীনের লাঞ্ছনা। হতে পারে তার দুই পক্ষই নারী—যেমন ওপরের উদাহরণটিতে কিংবা 'মেয়ের নাম ফেলি/যমকে দিলেও গেলি, জামাইকে দিলেও গেলি' বা 'বৌটি ভাল বটে/ঠোনা খেয়েও বাটনা বাটে'-র মতো অনেক প্রবাদে, কোথাও বা আবার একপক্ষে সরাসরি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আর অন্যদিকে তার ফাঁদে পড়া অধিকারহীন মেয়ের জীবন ধরা দেয়। যেরকম 'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই'—ইত্যাদি, অথবা 'ফচকে ছুঁড়ি ফুলের কুঁড়ি/মড়িপোড়ানির ঝি/বিয়ের কালে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিছি'—যে ব্যবস্থায় ফুলের কুঁড়ি কিশোরীকে শুধু 'মড়িপোড়ানির ঝি' (হাঘরে গরিব) হওয়ার দরুনই বাবার বয়সী বৃদ্ধের লালসা তৃপ্তির ইন্ধন হতে হয়। এই শেষোক্ত মেয়েলি ছড়াটি তির্যকতায়, বিদ্রূপে ঝলমল করে ওঠে সতীদাহের চিতায় উঠতে যাওয়া নিরুপায় বধূর শেষ মুহূর্তে ঠাট্টা করে হেসে ওঠার মতো। এরকম ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন বাংলায় সত্যিই অসংখ্য। পরিমাণে ও বৈচিত্রে। এবং এগুলো মেয়েদেরই তৈরি, মেয়েরাই এগুলোকে বহন করে নিয়ে গিয়েছে, মেয়েদের নিজস্ব ভুবনেরই মানচিত্র এই অগণিত প্রবাদ বা প্রবচন। যাকে বলাই যায় আমাদের Womenspeak.

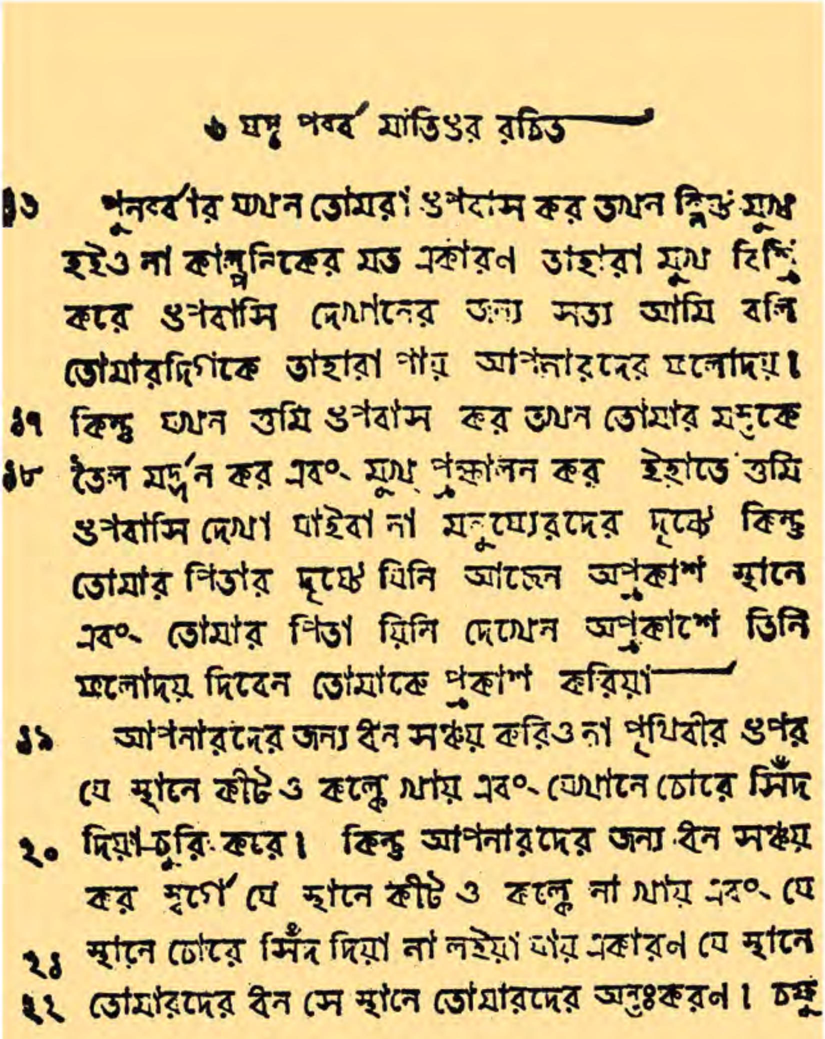
কিন্তু মেয়েদের 'নিজ কথা নিজস্ব ভাষায়'—এরও বাইরে ভাষার বিস্তৃত অঙ্গনে রয়ে গিয়েছে ঝাঁকে-ঝাঁকে শব্দ যা ক্ষমতাহীনের প্রতি ক্ষমতার মনোভাবকে অভ্রান্ত প্রকাশ করে। বৃহত্তম ক্ষমতাহীন গোষ্ঠীর, অর্থাৎ মেয়েদের, সম্পর্কে পিতৃতন্ত্রের মনোভাবকে প্রকাশ করে আসা বহু-বহু শব্দ ছড়িয়ে আছে আমাদের মুখের ভাষায়। আপাতনিরীহ এরকম বহু শব্দ আলাদা করে খেয়াল না-করলে সেইসব শব্দের মধ্যে লুকনো লাঞ্ছনা বা অধিকারহীনতার চেহারা ধরাও পড়ে না, অতিব্যবহারে সেগুলোর ধার লুকিয়ে পড়েছে। এরকম দু-চারটিকে পরীক্ষা করে দেখা যাক। ধরা যাক 'বিবাহ' শব্দটি। বিশেষভাবে বহন করে নেওয়া। অর্থাৎ শব্দ ও তার অর্থ নিশ্চিতভাবেই পুরুষতন্ত্রের দিক থেকে পরিণয়ের একটি সংজ্ঞা। 'ছেলের বিয়ে' আমরা বলি বটে, কিন্তু মূল শব্দটি মেয়েকে, কন্যাকেই 'বহন করে নিয়ে যাওয়া'-র কথা বলে। সে যেন নিজে যাওয়ার মতো কোন মানুষ নয়, পিঁড়েয় বসিয়ে তাকে তুলে আনা হবে আর পালকিতে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া—বস্তুকে যেমনটি করা হয়। এবং নিয়ে যাওয়া তো হবে





তাকেই, মেয়েকে। কন্যাকে। 'বিবাহ' করে কন্যাটিকে যেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয় সেটি তার 'বাপের বাড়ি'। যদিও একটি ভবন সংসার হয়ে ওঠে মা-বাবা দু'জনেরই যত্নে ও পরিশ্রমে, তবু তার সামাজিক ও ভাষিক স্বীকৃত পরিচয় 'বাপের বাড়ি' বলেই। বাবা অবর্তমান হলেও সেটি বাপের বাড়িই থাকে, মায়ের কি ঠাকুমার বাড়ি নয়। যদিও একটি পরিবারকে সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে গড়ে তোলেন মূলত বাড়ির মেয়েরাই। সংসারে শিশুশিক্ষা থেকে খাদ্য, রান্না, সংরক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা—এগুলো প্রায় পুরোপুরি মেয়েদেরই দৈনন্দিন দায়িত্ব তবু সে সংসার মায়ের বাড়ি হয় না। শাশুড়ির বাড়িও না। ভার্যা, অর্থাৎ যার ভরণ-পোষণের ভার নেওয়া হয় সে যে 'পুত্রার্থে'-ই নীত সে কথা আর নতুন নয়, কিন্তু পত্নীর যে অন্য প্রতিশব্দ, 'জায়া'—তার অর্থও প্রায় একই। পত্নীর গর্ভে পতি স্বয়ং আত্মজ রূপে জন্ম নেন তাই পত্নীকে 'জায়া' বলে, বলছেন অভিধানকার। আত্মজ রূপেই তো জন্ম নেবেন পতি, আত্মজা রূপে তো নয়—পুত্রের জন্ম দেওয়াই আসল নির্ধারিত কাজ একটি মেয়ের। অথচ আশ্চর্য এই যে, পত্নী ও রমণী হিসেবে তার যে ভূমিকা তা কিন্তু কখনও সামাজিক ভাবে উল্লিখিত হয় না, পাছে তাতে পরোক্ষভাবে হলেও নারীর যৌনতার নিজস্ব কোনও স্বীকৃতি তৈরি হয়। একজন পুরুষ একাধিক মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, এটা স্বাভাবিক বলেই ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু একটি মেয়ের ক্ষেত্রে সেই স্বাধীনতার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। 'সপত্নী' শব্দের কোনও পুংলিঙ্গ নেই। তাই কি 'সন্তান জন্ম', 'পুত্রজন্ম'-কেই ভাষার মধ্যে মেয়েদের বিবাহিত জীবনের সার্থকতা বলে জবরদস্তি? বিজ্ঞান কিংবা বাস্তব যাই বলুক না কেন, 'বন্ধ্যা' 'বাঁজা' এসব নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। আবার কেবল 'সন্তানবতী' এমনকী 'পুত্রবতী' হলেও হবে না, উপযুক্ত লাইসেন্সও থাকতে হবে। বিবাহিত স্বামীর আসঙ্গ ছাড়া অন্য পুরুষসঙ্গে, বিশেষত প্রেমিক পুরুষ(জার) সংসর্গে উৎপন্ন সন্তানকে বলা হবে 'জারজ'। সকলেই জানেন বাংলা ভাষায় এ-শব্দ অত্যন্ত হীন অর্থদ্যোতক। শব্দটি যদিও জাতককে বর্ণনা করে কিন্তু তার সঙ্গে লিপ্ত কলঙ্ক চিহ্নিত করে সন্তানের মায়ের সতীত্বহীনতার দিকে। সতীত্বহীনতার চেয়ে বড় কলঙ্ক এই সমাজেও মেয়েদের জন্য বেশ কম। স্পষ্টতই সংশ্লিষ্ট পুরুষের জন্য কোনও কালিমাচিহ্ন কোথাও থাকে না। পুরুষ 'হিরের আংটি'। 'দোজবর' এমনকী 'তেজবর' তো নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দ।

শুধু অনাদরেরই চিহ্ন বহন করে ভাষা, এমন নয়। আদরের চিহ্নও থাকে বইকী! যেমন 'জামাই আদর' করা। 'বউ আদর' বলে কোনও শব্দ হয় না তো। 'মেয়ে আদর'-ও নয়। 'সৌভ্রাতৃত্ব' বলে একটা শব্দ আছে বটে কিন্তু মেয়েদের বেলায়? ইংরেজি সিস্টারহুড-এর আদলে হিন্দিভাষায় একটা সুন্দর শব্দ তৈরি হয়ে গেল 'বহনাপা'। বাংলায় কি মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের


৬ ষষ্ঠ পর্ব্ব মাত্তিওর রচিত——

১৬ পুনর্ব্বার যখন তোমরা উপবাস কর তখন স্লিষ্ট মুখ
হইও না কাল্পনিকের মত একারন তাহারা মুখ বিশি
করে উপবাসি দেখানের জন্য সত্য আমি বলি
তোমারদিগকে তাহারা পায় আপনারদের ফলোদয়।
১৭ কিন্তু যখন তুমি উপবাস কর তখন তোমার মস্তকে
১৮ তৈল মর্দ্দন কর এবং মুখ প্রক্ষালন কর ইহাতে তুমি
উপবাসি দেখা যাইবা না মনুষ্যেরদের দৃষ্টে কিন্তু
তোমার পিতার দৃষ্টে যিনি আছেন অপ্রকাশ স্থানে
এবং তোমার পিতা যিনি দেখেন অপ্রকাশে তিনি
ফলোদয় দিবেন তোমাকে প্রকাশ করিয়া——
১৯ আপনারদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না পৃথিবীর উপর
যে স্থানে কীট ও কলঙ্ক খায় এবং যেখানে চোরে সিঁদ
২০ দিয়া চুরি করে। কিন্তু আপনারদের জন্য ধন সঞ্চয়
কর স্বর্গে যে স্থানে কীট ও কলঙ্ক না খায় এবং যে
২১ স্থানে চোরে সিঁদ দিয়া না লইয়া যায় একারন যে স্থানে
২২ তোমারদের ধন সে স্থানে তোমারদের অন্তঃকরন। চক্ষু

সলিডারিটি হবে না?

ভাষা তো একই সঙ্গে নদীর স্রোত আর তটভূমি। চলছে আর সমাজের চলার চিহ্ন রয়ে যাচ্ছে ভাষার তটভূমিতে। সব ভাষারই। বাংলায় এখনও বুঝি বড় প্রকট মেয়েদের ভাল না-বাসার, মর্যাদা না-দেওয়ার ধরন, ভাষা তাই এত অসমচিহ্ন।

নিভার গল্পও তাই। বহু কষ্টে ঠিকানা জোগাড় করে জেলের ওয়েলফেয়ার অফিসার যখন পুলিশ প্রোটেকশনে ব্যাকুল নিভাকে তার হুগলি জেলার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন, তার মাসখানেক পর জেলের টিচার বেলাদির পরিশ্রমের সার্থকতা দেখা দেয় একটি পোস্টকার্ডের রূপ ধরে। আবার বিয়ে করে গুছিয়ে সংসার করছে নিভার বর। 'খোকাকে তাহারা আমার কাছে আসিতে দেয় না। খোকা আমাকে মা বলে না, বলে পাগ লি। তা ছাড়া আমাকে ঘরে উঠিতে দেয় না। গোয়াল ঘরে শুই।'

'তাহারা' তো কেবল একটি সর্বনাম। কত কিছু বোঝাতে পারে মাত্র সর্বনামে?

খোলাখুলি বলছি সমরেশ মজুমদার

ইচ্ছে বিরক্তি রাগ, বেফাঁস কিছু কথা

এক বন্ধু আক্ষেপ করছিলেন, তাঁর বাড়ির ছেলেমেয়েরা কেউ বাংলা গল্পের বই পড়তে চায় না। ইউরোপ আমেরিকায় বেড়াতে গিয়ে সেখানকার বাঙালিদের ছেলেমেয়েদের বেশিরভাগই বাংলা বলতে পারছে না দেখে আমি মোটেই দুঃখিত হইনা। ঘরে-বাইরে, স্কুলে তারা যে ভাষায় কথা বলছে তার সঙ্গে বাংলার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক যখন নেই, তখন তারা খামোকা বাংলা বলতে যাবে কেন? কোনও কোনও গোঁড়া বাবা-মা জোর করে অআইঈ শেখাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়েছেন। আমার পূর্বপুরুষ বাংলা বলত অতএব বাংলা ব্যবহারের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও আমাকে বাংলা শিখে রাখতে হবে কেন? সে দেশের মেয়েকে বিয়ে করে ওখানকার ভাষায় কথা বলে তো বেশ আছে। আমাদের প্রজন্মের কিছু যুবক ওদেশে গিয়ে বিদেশিনীর প্রেমে পড়ে মধ্যবিত্ত মানসিকতার কারণে অপরাধ-বোধে ভুগত। তাই বউকে নিয়ে দেশ-সফরের আগে কয়েকটা বাংলা শব্দ শিখিয়ে নিয়ে আসত। যে মেয়েটি স্প্যানিশ ছাড়া ভাঙা ইংরেজিতে অভ্যস্ত তাকে শ্বশুর-শাশুড়ির স্নেহ পাওয়ার জন্যে বাংলা শব্দ শিখতে হত স্বামীর অনুরোধে। এক-আধজনের শেষপর্যন্ত ভাললাগা তৈরি হয়ে যেত, বাক্যও বলতে অভ্যস্ত হত, বেশিরভাগ 'বাবা' এবং 'মা' ছাড়া মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি। আর এখন সেই মেয়েকে বাংলা শেখাতে তরুণটি চাইবেই না। কারণ বউ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে।

বন্ধুটিকে বললাম, 'আপনি আক্ষেপ করছেন কেন?'

'এ কী বলছেন? বাঙালি হয়ে বাংলা পড়বে না?'

'ওরা কী করছে?'

'নাইন-টেনে পড়ে। একজন তো কমপিউটারের কোর্স শেষ করে বাইরে চলে যাচ্ছে।' বন্ধু বললেন, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলতে পারে না। পথের পাঁচালি যে বাঙালি পড়ল না তাকে বাঙালি বলতে খুব খারাপ লাগে।'

'ওরা বই পড়ে না?'

'সব ইংরেজি। এমনকী স্প্যানিশ ভাষায় গল্প ইংরেজিতে অনুবাদ হয়ে এলে গোগ্রাসে গেলে। এরকম হলে তো পঁচিশ বছর পরে বাংলা কেউ পড়বে না।'

'এদের সংখ্যা কত?'

'মানে?'

'আট কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর ষাট শতাংশ যদি বাঙালি হয় তা হলে তাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটির মতো। ধরে নিচ্ছি পড়ুয়াদের সংখ্যা এক কোটি। এদের মধ্যে শতকরা কত পড়ুয়া বাংলা পড়ে না? দু-তিন লক্ষ কি পাঁচ? বাকি পঁচানব্বুই লক্ষ যারা বাংলা মিডিয়ামে পড়ে, ইংরেজিতে অভ্যস্ত নয় তাদের ক'জন বাংলা গল্পের বই পড়ে? শতকরা এক কি দু'জন। মন্দ কী।'

'আপনি নিজে বাংলায় লেখেন, আপনার খারাপ লাগছে না?'

'বিন্দুমাত্র নয়। শুনেছি আগে বাংলা বই-এর বিপুল পাঠক ছিল। আমরাও অল্পবয়সে গপগপিয়ে বাংলা বই গিলেছি। সেসময় শরৎচন্দ্রকে বাদ দিলে বিখ্যাত লেখকদের ক্লাসিক বইগুলোর বিক্রির পরিমাণ জানলে অবাক হয়ে যাবেন। আমার আগে শংকর বা সুনীল গাঙ্গুলির বই তাঁদের থেকে অনেক বেশি বিক্রি হয়ে থাকে। আমার কালবেলা উপন্যাসটি এক লক্ষের বেশি বিক্রি হয়েছে। অন্তত তিন লক্ষ পাঠক পড়েছেন। আর এর সঙ্গে বাংলাদেশের পাঠকদের ধরলে তো হিসেব ঠিক রাখা যাবে না। খারাপ লাগা দূরের কথা, বেশ ভাল লাগে।'

আমার কথা শোনার পরেও ভদ্রলোক গাঁইগুঁই করছেন দেখে জিজ্ঞাসা করলাম।

'আপনি স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ছেলেবেলা থেকে পড়ে আসছেন। মনে করে বলুন তো?'

'ওই অ আ ক খ?'

'হ্যাঁ'।

প্রস্তাবটা নেহাতই ছেলেমানুষের মতো, বন্ধুর ঠোঁটে সেইরকম হাসি ফুটল। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'অ-আ-ই-ঈ,উ,ঊ, ঋ', বলে থামলেন, 'কী, পারছি তো?'

'সম্পূর্ণ করুন।'

স্বরবর্ণ ঠিকঠাক বললেন বন্ধু। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের মাঝখানে গিয়ে আটকে গেলেন। নিজের ওপর রেগে গিয়ে আবার গোড়া থেকে বলতে আরম্ভ করে ঠেকে গেলেন নতুন বর্ণে পৌঁছে। শেষ পর্যন্ত বললেন, 'কতকাল আগে পড়েছি। গোলমাল তো হবেই।'



আমার বাবা চা-বাগানে চাকরি করতেন। সেখানকার অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তাঁর যে তফাত আছে তা বাল্যকাল থেকেই বুঝতে পারতাম। কলকাতা থেকে সাপ্তাহিক পত্রিকা, মাসিক পত্রিকা ডাকে বাবা নিয়মিত আনাতেন। আমি জলপাইগুড়ি শহরের স্কুলে পড়তাম। ছুটিতে চা-বাগানের বাড়িতে গেলে দুপুরবেলায় বাবার একটা বিরাট কাঠের আলমারি খুলে বসতাম। সেখানে বিভিন্ন ধরণের পত্রিকা সযত্নে সাজানো ছিল। বারো বছর বয়সে 'প্রবাসী' পত্রিকা সেখানেই দেখতে পেয়েছিলাম। ছিল আনন্দবাজার পত্রিকার একটি পুজো 'সংখ্যা' সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ছাপা হয়েছিল। একাধিক নয়। একটি উপন্যাস। 'উল্টোরথ', 'সিনেমাজগৎ', 'নবকল্লোল'-এর পুজোসংখ্যাগুলো আলাদা আলাদা তাকে থাকত। থাকত 'দেশ' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলো। দুপুরগুলো আমার কেটে যেত তারাশংকর, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রদের সঙ্গে। সে বড় সুখের সময় ছিল। আমি যে ওগুলো গিলছি তাতে মায়ের কোনও আপত্তি ছিল না। বাবা খবর রাখতেন না।

একটু বড় হয়ে বেশ কয়েকজন লেখকের লেখায় মুগ্ধ হয়েছিলাম যাঁদের কথা আজ কারও মনে নেই। যেমন দীপক চৌধুরী, ননী ভৌমিক, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। দীপক চৌধুরীর লেখা 'পাতালে এক ঋতু' প্রথমবার পড়ে ভাল বুঝতে পারিনি। দ্বিতীয়বারে কিছুটা। বাবার আলমারিতে ওই বই ছিল। পাঠক হিসেবে বাবার মূল্যায়ন করার ক্ষমতা তখন আমার ছিল না। এই দীপক চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আঠাশ বছর বয়সে। তখন আমি 'দেশ' পত্রিকায় ছোট গল্প লিখি। বছরে তিন-চারটে গল্প বের হয়। কেউ আমাকে চেনে না। সেইসময় আমি লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় এবং অভ্র রায়ের সঙ্গে দার্জিলিং-এ বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন সমরেশ বসু পুজোসংখ্যার লেখা লিখবেন বলে দার্জিলিং-এ ছিলেন। এক বিকেল শেষ হওয়ার সময়ে দার্জিলিং-এর ম্যালে সমরেশদার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি সেসময় সত্যজিৎ রায়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা ছবির নায়কের মতো



মনীষাদের দেখছি সবিস্ময়ে। সমরেশদাকে ধুতি পাঞ্জাবিতে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। দার্জিলিং-এ দেখলাম কোট প্যান্ট এবং টুপিতে বেশ স্মার্ট হয়ে হেঁটে আসছেন। সাধারণ কিছু কথা বলার পর সমরেশদা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি দীপক চৌধুরীর নাম শুনেছ?'

'হ্যাঁ। ওঁর লেখা 'পাতালে এক ঋতু' পড়েছি।'

'বাঃ। চলো, আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'ওই তো, অজিত ম্যানসনে।' ম্যালের গায়ে বিশাল বাড়িটি দেখালেন সমরেশদা। নীচে সুন্দর সুন্দর দোকান। দেখে ফ্ল্যাটবাড়ি বলেই মনে হল।

সমরেশদার পিছন পিছন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে বুঝলাম সত্যি ওটা ফ্ল্যাটবাড়ি। তার একটার দরজার বেল বাজালেন সমরেশদা। দরজা খুলল একটি নেপালি প্রৌঢ়। সমরেশদা জানতে চাইলেন সাহেব বাড়িতে আছেন কি না? নাম জিজ্ঞাসা করল না লোকটা। সম্ভবত সে সমরেশদাকে আগেও দেখেছিল। আমাদের বাইরের ঘরে বসতে বলে সে ভেতরে চলে গেল। ঘরটি ছিমছাম। দেওয়ালে কোনও ছবি নেই। মিনিট খানেকের মধ্যে যিনি বেরিয়ে এলেন তিনি যৌবনে অবশ্যই সুদর্শন ছিলেন। বয়স বাড়লেও তাঁকে বৃদ্ধ বলা যাচ্ছে না।

'গুড ইভনিং। আমি জানতাম আপনি সময় রাখবেন।' ভদ্রলোক উল্টোদিকে বসলেন।

'কী করে জানলেন?'

'আপনার মধ্যে বাঙালিয়ানাটা বেশ কম। যে 'বিবর' লেখে আবার 'গঙ্গা'-ও, সে জাবর কাটে না। ওয়েল, এই ছেলেটির পরিচয়?' দীপক চৌধুরী আমার দিকে তাকালেন।

'আমাদের নাম এক। ও মজুমদার। ভাল লিখবে বলে সাগরদা মনে করছেন।'

'সমরেশ মজুমদার? কোনও বই—?'

'না। এখনও তার যোগ্য হইনি।'

'কিন্তু, কিন্তু, 'বড় পাপ হে'। তাই তো? আপনার ছোটগল্প?'

'হ্যাঁ।'

'ওই জীবন দেখেছেন?'

'খানিকটা।'

'খানিকটা দেখেই পুরোটা লিখে ফেললেন? বাঃ। পড়ে আমি বিশ্বাস করেছিলাম আপনি বৃদ্ধা বেশ্যাদের জীবন জানেন, জঙ্গলের বুনো গন্ধ আপনার চেনা। যাক গে, কি নেবেন সিনিয়র? ওয়াইন?' দীপক চৌধুরী সমরেশদার দিকে তাকালেন।

'না।' সমরেশদা হাসলেন।

'ওহো!' দীপক চৌধুরী তাঁর কাজের লোককে ডেকে হুইস্কি পরিবেশন করতে বললেন। আমি তখনও ওই রসে দীক্ষিত ছিলাম না। বললেন, 'সরি, আপনাকে এইসময় চা বা কফি খাওয়াতে পারব না। হুইস্কির গ্লাসের পাশে চায়ের কাপ খুব অশ্লীল বলে মনে হবে। কিছু মনে করবেন না।'

ওঁরা কথা বলছিলেন, আমি লক্ষ করছিলাম। দীপক চৌধুরীর কথা বলার ধরন, আচরণ, মোটেই বাঙালিসুলভ লাগছিল না। অথচ ইনি 'শনিবারের চিঠি'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। দার্জিলিং-এর ঠান্ডায় একা বাস করেন। হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন, 'আমি যতটুকু লিখতে পারি তাই লেখার চেষ্টা করি। কেউ পড়ল কি পড়ল না তা নিয়ে ভাবি না। জানি, বই বিক্রি না হলে প্রকাশক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, আমার সম্পর্কে আগ্রহ থাকবে না। কিন্তু আমি বাঙালিকে ঘাড় ধরে আমার বই পড়াতে পারব না। হয়তো বেঁচে থাকতে থাকতেই দেখব বাঙালি আমাকে ভুলে গিয়েছে। বলেই আমার দিকে তাকালেন, 'বরেন বসুর নাম শুনেছেন?'

'হ্যাঁ। রঙরুট-এর লেখক।'

'বাঃ। 'তিতাস একটি নদীর নাম' লিখেছিলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। যে কোনও সাহিত্য এই লেখাগুলোর জন্যে সম্মানিত হবে। অথচ বাঙালি এই লেখকদের মনে রাখেনি। কী এসে গেল!'

বেশ রাত্রে বেরিয়ে এসেছিলাম আমরা। সমরেশদা বলেছিলেন, 'কখনও কখনও আমারও মনে হয়, কে মনে রাখল ভেবে কী হবে? নিজের তৃপ্তির জন্যেই তো লিখি। মিস্টার ঘোষাল হয়তো একটু বেশি মাত্রায় হতাশায় ভুগছেন, কী করা যাবে!'

'মিস্টার ঘোষাল?' আমি অবাক হলাম।

'দীপক চৌধুরী ওঁর ছদ্মনাম।'

আমি নিজে এই ভাবনায় বিশ্বাসী নই। একজন লেখক লেখার ভাবনা তাঁর মতো করে ভাববেন, লেখা হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য তাঁর। কিন্তু সেই লেখা বই হয়ে প্রকাশিত হওয়ার পর যদি পাঠক না পড়েন তা হলে বুঝতে হবে কোথাও খামতি থেকে গিয়েছে। নিম্নমানের লেখা যাঁরা লেখেন তাঁদের তো পাঠকরা উপেক্ষা করবেই। আবার প্রচণ্ড প্রতিভাবান লেখক হওয়া সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী ছাড়া বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠীকে আকর্ষণ করতে পারেননি এমন উদাহরণ আছে। কমলকুমার মজুমদার এমন একজন লেখক। তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে সন্দেহ কোনও মূর্খ করবে না। কিন্তু কেন তিনি গৃহীত হলেন না তা নিয়ে আলোচনা খুব কম দেখেছি।

কিছু বই প্রকাশিত হওয়ার পর একটি ব্যাপার লক্ষ করলাম। আমি কোনও পত্রিকায় যে উপন্যাস লিখেছি সেটি প্রকাশক বই করে বের করতে চাইলেন না। আমাদের মধ্যে কোনও লিখিত চুক্তি হল না। বেশিরভাগ প্রকাশক না জিজ্ঞাসা করলে জানান না কত কপি ছাপছেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত আনন্দ পাবলিশার্স ছাড়া কেউ বাৎসরিক বিক্রির হিসেব দিতেন না। বইটি বিক্রি হচ্ছে কি না তা বুঝতে পারি তার বিজ্ঞাপন দেখে। সংস্করণ হলে তাঁরা বিজ্ঞাপন দেন। কলেজ স্ট্রিটের রেওয়াজ ছিল এগারোশো কপি বিক্রি হলে সংস্করণ ঘোষণা করা। কোনও সংস্কার ছাড়া কী করে সংস্করণ হয় জানি না। মুদ্রণ বলতে অসুবিধে কোথায়? আনন্দ পাবলিশার্স ছাড়া অন্য কোনও প্রকাশক বইতে কত কপি ছাপা হল তা লিখে দেওয়ার সৌজন্য দেখান না। শুনেছি এমন প্রকাশক আছেন যিনি পাঁচশো কপি বিক্রি হয়ে গেলেই বিজ্ঞাপন দেন, প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ। আর এই সব ব্যাপারে লেখকের কোনও ভূমিকা থাকে না। বছরের শেষে প্রকাশক বিক্রির পরিমাণ যা জানাবেন তার ওপর শতকরা দশ, পনেরো অথবা কুড়ি শতাংশ লেখকের প্রাপ্য হবে। কে দশ কে পনেরো অথবা কে কুড়ি শতাংশ পাবেন সে-ব্যাপারে একটা প্রাথমিক কথা হয়েই থাকে। এই বৈষম্যের কারণ আমার অজানা। প্রকাশক এই ব্যবসার প্রথম ও শেষ ব্যক্তি। কিন্তু অবাক হয়ে দেখি, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যেভাবে ব্যবসাটি চালানো হত আজও সেই একভাবে চলছে। এর মধ্যে পৃথিবীতে কত কাণ্ড ঘটে গেল। কমপিউটার এল কিন্তু তার কোনও প্রভাব বই ব্যবসায় পড়ল না। এঁরা একজন লেখকের বই ছেপে সাপ্তাহিক বা পাক্ষিকে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন দিয়ে বসে থাকেন এই ভেবে যে পাঠক সেই বিজ্ঞাপন দেখে তাঁর দোকানে এসে বই কিনে নিয়ে যাবে। এই অবাস্তব চিন্তাধারার পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আজ যখন গোটা পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা ক্রেতার কাছে পৌঁছে যাচ্ছে নানান আকর্ষণ তৈরি করে তখন এঁদের অবস্থান শালগ্রাম শিলার মতো। লেখকের সঙ্গে এদের সম্পর্ক প্রায় স্বামী-স্ত্রীর মতন। বিশ্বাস না করলে সম্পর্ক ভেঙে যেতে বাধ্য। এই মুহূর্তে কলেজ স্ট্রিটে তিন কি চারজন প্রকাশক বিশ্বাসভঙ্গ করেন না বলেই জানি।

তবু বাংলা বই বিক্রি হয়। বিদেশে তো বটেই, এই বইমেলাতেও ক্রেতার সংখ্যা অনেক। বাংলা বই কেনার মানুষ কমে গিয়েছে, বাংলা বই পড়ছে না বলে আমি আক্ষেপ করি না। আমার আক্ষেপ, বাংলা লেখক তৈরি হচ্ছে না। এই লেখকের অভাবেই কয়েক বছরের মধ্যে মৃত লেখকদের বই-এর মেলা হয়ে গেলে একটুও অবাক হব না।


ছোট, বড় সবার।
স্পোর্টস্ ও ক্যানভাসের বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
69402
Rs 299/-
Genesis 2879
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street 033 22861510/11 Free School Street (Opp. Fire Brigade) 033 22861506

ক্রস কানেকশন

টেলিফোন একটি বিষম বস্তু। বর্ণে কৃষ্ণাঙ্গ, কর্ণে উচ্চাঙ্গ। দালান চত্বরে গ্যাঁট হয়ে বসে-থাকা জগদ্দল শিবলিঙ্গ টাইপ। থেকে-থেকে ডাক দিচ্ছে কুবো পাখির মতো। ঘ-র-র-র...ঘ-র-র-র। যেন বিরক্ত হয়ে বলছে, ওহে এসো, দয়া করে আমাকে তুলে পরিত্রাণ করো। বেতের টুল-এ বসে গ্যাঁজাগপ্পো মারো এখন ঘণ্টা দুয়েক। আর আমাকে জ্বালিও না হে। সে কথা কে আর শোনে! নিস্তরঙ্গ নিথর দুপুরে সে ফের বেজে ওঠে অকস্মাৎ, বহু দূরের আগমনী গান নিয়ে, গ্রামোফোনের মতন, ডাক দেয় সুগভীর চালে। আমাদের সাবেকি বাড়ির খোলা প্রাঙ্গণে মূর্তিমান ঝঞ্ঝাটের মতো টেলিফোন বাজতে থাকত দিনভর। দোতলায় রাখা ছিল সেটি। একতলায় বাস ছিল মদনের। আমারই বয়সি এক বিজ্ঞ টিয়াপাখি। কাঁচালঙ্কা, ছোলা সহযোগে সে ছিল দিব্যি পরিপাটি। বাংলা ভাষা-চর্চায় তার ছিল অপরিসীম মনোযোগ। তার অধীত জ্ঞান সম্পর্কে অতিথি সন্দেহ প্রকাশ করলে সে এক ফুৎকারে তাকে উড়িয়ে দিয়ে বলত—তুই কে-এ-এ...তুই কে-এ-এ? বলাবাহুল্য এই দার্শনিক প্রশ্ন তোলার পর মলিন অতিথি ঝটপট কেটে পড়তেন। টেলিফোনের সঙ্গে মদনের জীবনের এক গূঢ় সম্পর্ক ছিল। যখনই টেলিফোনটি ঘ্যানঘ্যান বাজত, মদনও একতলা থেকে তার ডাক শুরু করত, তুই কে-এ-এ...সুর দিয়ে। টেলিফোনটি কার—সে ব্যাপারে তার অনুসন্ধিৎসু মনটি সদাজাগ্রত ছিল। সাধারণত এক-দু'বার কিড়িং কিড়িং-এ ফোনটি কেউ ধরত না। আর একটু বাজতে দেওয়া হত। তেমনই নিয়ম অলিখিত। ফলে দোতলায় কৃষ্ণকলি এবং একতলায় ব্রজবুলি একসঙ্গে চলত। এর সঙ্গে যুক্ত হত রাঙাদাদু আর ছোড়দাদুর যুগ্ম কোরাস—ফোন এয়েছে...ফোন এয়েছে। ঝড় বা বৃষ্টি এলেও তাঁরা এমনই চেঁচাতেন। এই ঘোষণার বিষয়ে তাঁরা যতটা তৎপর ছিলেন, ফোন ধরার ব্যাপারে কিন্তু ততটা ছিলেন না। একটা যন্ত্র, নিজে থেকেই খামোকা বেজে-বেজে উঠছে, জিনিসটাকে তত ভাল চোখে কখনওই দেখেননি তাঁরা। ধরলে যদি ফেটে যায়! ফলে টেলিফোন বাজতে থাকত, থাকতই। সঙ্গে ওই পাখি আর দাদুদের উদ্দাম কনসার্ট। টানাপোড়েনে ফোনটা আর ধরা হত না অনেক সময়ই। আকাশবাণী-র 'অনুরোধের আসর'-এর গানের মতো, হয়ে হয়ে তা শেষ হয়ে যেত। অনেক ফোন, জানাই হয়নি কে করেছিল! কোনও কলার আইডি ছিল না তখনকার বুকপকেটে।

'ল্যান্ডলাইন' বলে কোনও শব্দ তৈরি হয়নি তখনও। ফোন মানে একটাই, কালো গাবদা জিনিস। নিরেট বডি, রিসিভারটি ওঠাতেও কিঞ্চিৎ জোর দিতে হত, বুকের কাছটিতে ধাতব দশ আংটি, পরস্পর জোড়া, ভিতরে ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর পড়া যাচ্ছে। শূন্য ডায়াল করতে গেলে আঙুল পেঁচিয়ে প্রায় পৃথিবী প্রদক্ষিণ দিতে হত, উরেব্বাস! আঙুল ব্যথা হয়ে যেত ওই ব্যায়ামে। একটা সুবিধে ছিল, নাম্বার হত ছয় সংখ্যার। এখনকার মতো দশনম্বরী হলেই হয়েছিল আর কী! সেই ঘোরাতেও মাঝে-সাজে কবজি টনটন করত। কারণ একবারে ফোন পাওয়া যেত না কখনও। প্রথমে ফোনের কান দু'টো টিপে-টিপে ডায়াল টোন আনতে হত। ক-র-র-র আওয়াজ শুনে তবে ডায়াল। প্রথম দানে নিশ্চিতভাবেই পাওয়া যেত না। দ্বিতীয় দানে—উহুঁ। তৃতীয় বা চতুর্থ দানে বিরক্তিতে একটা-না-একটা নম্বর ভুল হয়ে যেতই। শেষমেশ কেষ্ট মিলত। অনেক কষ্টে ফোন পাওয়া যেত। বিজ্ঞানের কি মহিমা! সায়েন্সের কি চৌধুরি! শহরের সম্পূর্ণ দুই প্রান্তে বসে মানুষরা কথা বলতে শুরু করত। টকটক টকাটক। কথা চলছে তো চলছেই। যতক্ষণ খুশি, অবিরাম। এমন মধুক্ষণেই আবির্ভাব হত তার। কার? কালোফোনের কালাপাহাড়-এর। বেরসিক বিভীষিকা। ক্রস কানেকশন। আপনার ফোনে সিঁদ কেটে সে ঢুকে পড়ল বেমালুম। রবাহূত এক রাস্কেল। ইনিয়েবিনিয়ে সে বলতে লাগল...ও দাদা...ও দিদি... একটু ছাড়ুন না। লাইনটা একটু ছাড়ুন না। দূর মশয়...।

টেলিফোন-বিজ্ঞানে ক্রস কানেকশন কাকে বলা হয়? প্রকৃত সংজ্ঞা হল, দুই ব্যক্তি যখন ইচ্ছেমতো খেজুর করছেন, তার মধ্যিখানে যখন অপরিচিত কেউ বাগড়া মারেন—সেটিই ওই। একজনের ফোন ভুল করে অন্যজনের কাছে চলে গেলে, তা-ও এক ক্রস কানেকশন বটে, কিন্তু ক্লাসিক কেস-এ তিনজন থাকবেনই। ওই বেমক্কা ব্যক্তি লাইনটি একবার কেটে ফের জুড়তে গেলেও, ঠিক তিনি পৌঁছে যাবেন ওই নাছোড় কথোপকথনে। বারবার এমন হওয়ার পর তিনি ক্রমাগত তাড়া



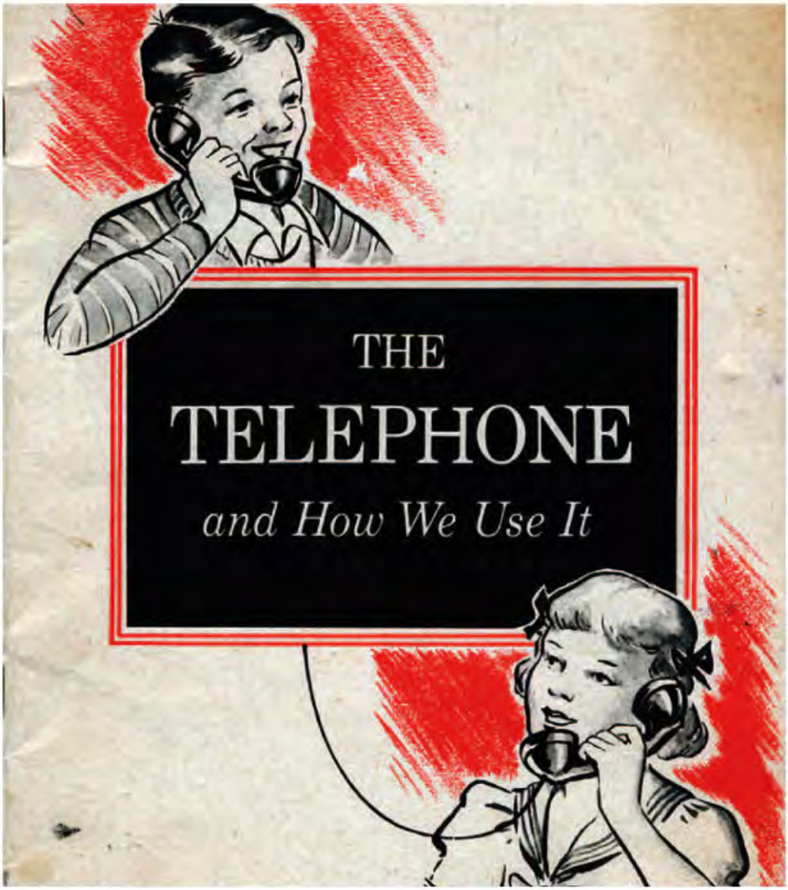
মারতে থাকবেন অন্য সংযোগটি কেটে দেওয়ার জন্য।

তা ছাড়া তাঁর উপায়ও বা কী! কারণ সে-সময় তো কোনও ফোন এক ঘণ্টার নীচে শেষ হত না। কী সব সুখের দিন ছিল, তখন একটা কল মানে যতক্ষণ খুশি বকর-বকর-বকর। কল তো নয় কলকাকলি। রাজনৈতিক পার্টির মিছিলের চেয়েও লম্বা হত ফোন কল। এক কানে ব্যথা করলে, একটু বিশ্রাম নিয়ে ফের শুরু হত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। এবার অন্য কানে। সকালবেলার ফোনে শালীর সঙ্গে সামান্য রসিকতা করে খেতে বসে গেলেন জামাইবাবু, অফিসে দেরি হয়ে যাবে, রিসিভার-টি টিকটিকির মতো চিৎ হয়েই পড়ে রইল, যতক্ষণ না দিদি ডালটি সাঁতলিয়ে, খাওয়া শেষের হাতমোছাটি বাড়িয়ে তবে ফোন ধরতে আসেন; দিদি যখন হ্যালো-হ্যালো করছেন, সে-সময় বোনটি অবশ্য উল্টোদিকে নেই, দিদির দেরি হচ্ছে দেখে তিনি স্নানটি সেরে নিতে গিয়েছেন, লাইনটি কিন্তু ছাড়েননি, পাগল নাকি, তারপর যদি লাইন না পাওয়া যায়! শেষমেশ দুই বোনের সংযোগ হয়, কথা হয়। মান অভিমান, ঝগড়া হয়, আবার মিটমাটও হয়ে যায়। বেলা পড়ে এলে দিদিই অবশ্য আগ বাড়িয়ে বলেন, এই এবার রাখি রে, তোর জামাইবাবুর আবার চলে আসার সময় হয়ে এল। এই ম্যারাথনে অন্য কেউ যদি ট্র্যাফিকে আটকায়, তার অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন! বারবার কড়া না-নেড়ে তার উপায় কী!

সব তৃতীয় ব্যক্তিই বিরক্তিকর হতেন না। অনেকেই ছিলেন খুব বুঝদার মানুষ। হয়তো বাড়ির গুরুতর কোনও সমস্যা নিয়ে উৎকণ্ঠা—ফোন চলছে—বিপথগামী স্বামীকে নিয়ে কী করা যায়, ক্রস কানেকশন-এর উটকো শুভানুধ্যায়ী কিছু সুপরামর্শ দিলেন। প্রাথমিকভাবে বিপন্ন গিন্নি খেঁকিয়ে উঠলেন, নিজের চরকায় তেল দিন তো... খানিক বাদে ও-দিকের বন্ধু বলল, উনি যা বলছেন, তা কিন্তু মন্দ নয়, ভেবে দেখতে পারিস... ভাবাভাবি ফোনাফুনি চলল আরও খানিকক্ষণ, ক্রস কানেকশনকারীর পরামর্শ মন দিয়ে শোনে দুই সখি... তৃতীয় রফাসূত্রে দাম্পত্য টিকে যায় সে-যাত্রা।

ফিচলেমিও কিছু কম চলত না। ক্রস কানেকশন-এ সিঁদ কাটলেন যিনি, চুপ করে আগে শুনে নিলেন বৈধ দুই পক্ষের কথোপকথন। আগে বুঝে নিলেন গপ্পো কোন খাতে বইছে। প্রেমে হয়তো তখন মরে যাচ্ছে ছটফট দু'টি প্রাণ। এই চোখটা কার? তোমার। এই নাকটা কার? তোম্মার। এই ঠোঁটটা কার? তোমম্আর। আর থাকতে না-পেরে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার ফোড়ন কাটলেন : এক্সকিউজ মি, লাইনটা কিন্তু আমার।





অযাচিত মন্তব্যে থমকে-চমকে গেলেন। চুপ করে রইলেন তাঁরা। তারপর ফিসফিস করে বললেন, শোনো, অন্য কোনও বদমাশ লাইনে ঢুকে পড়েছে। এখন রাখছি, পরে কথা হবে'খন। গোপন কথাটি পাঁচকান হওয়ায় তাঁরা ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিলেন স্বেচ্ছায়। নতুন অতিথির রসিকতা মোটেই বরদাস্ত হল না তাঁদের।

আবার ক্রস কানেকশন থেকে গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠার কাহিনিও কিছু কম নেই। এ শুধু রেডিও নাটক বা পাড়াজলসার শ্রুতিনাটকে শোনা গিয়েছে এমন নয়, বাস্তবেও কখনও কখনও সত্যি প্রেম হয়ে যেত। সম্পূর্ণ অচেনা, অজানা কেউ, কথার জালে হয়ে উঠতেন কাছের মানুষ। জেনে নিতেন আসল নম্বরটা। শুরু হত অন্য গপ্পো। অন্য সংলাপ। ফুট কাটতে-কাটতেই অন্য ফুল ফুটত। বসন্ত লাল পাপড়ি ঝরতি নতুন ডায়ালটোন-এ।

টেলিফোনের বন্ধুত্ব ভারি মারাত্মক ব্যাপার। যাঁরা-যাঁরা সারাদিন ধরে হাত ধরাধরির প্রেম চালিয়েছেন, তার পরেও বাড়ি এসে ফের বসে যেতেন নীরব রাত্রে। কী কথা হত এত? কেমন কথা হত? সে-সব স্পষ্ট করে বলা বেশ মুশকিল, তবু অনেক কথা হত। অনেক চুপ থাকা হত। সামনাসামনিতে যে-কথা বলা যায় না, তেমন কথা হত। দু'টো আলাদা জগৎ। একটা মুখোমুখি মুগ্ধতার। অন্যটা না-দেখা কল্পনার। টেলিফোনের কথা সামনের চেয়ে কত বেশি অকপট। রাগ বিরক্তি ঘেন্না ভালবাসা—সব। চোখে দেখছি না বলে অনেক গুছিয়ে বলা যায়। আড়াল সেই সাহস সামনে আনে। কত কুয়াশা আপনি কেটে যায়। কত মেঘ জল হয়ে অন্ধকারে মেশে। দুই পারের নিকষ কালো দুই টেলিফোন মধ্যরাতে কেমন অভিসার চালায় অভিমানপুঞ্জে, বিপন্ন দুই মুখ রিসিভারটিকে আরও আঁকড়ে ধরে, আরও আদর করে।

সব বাড়ির খোলা জায়গায় রাখা থাকে ফোন। পাশের ঘরেই হয়তো ঘুমোচ্ছেন বড় জ্যাঠা, একটু আওয়াজেই হয়তো ঘুম ভেঙে যায় অবিবাহিত পিসির—তাই ফিসফিস করে বলতে হয়। হাওয়ায়-হাওয়ায় বলতে হয়। নইলে জেগে যাবে, পণ্ড হয়ে যাবে সব। টেলিফোন অপারেটর-এর চেয়েও সুদক্ষ ফিল্টার-কণ্ঠে কথা বলতে হয়। আদরের নাম ডাকতে হয়। অমন নীরব স্বর ঠিকানা খুঁজে নেয় ঠিকঠাক। আর কখনও চুপ থাকতে হয়। শুধুই চুপকথা। সেখানে কিছু বলার নেই। কোনও মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় না একবারও। ধোঁয়াশা ভেদ করে আসা জোছনায়, আবছা আলোয় দেখা যায়, ভূতগ্রস্ত দুই মানুষ, কানে রিসিভার ছুঁয়ে বসে আছে নিষ্পলক। কথা তো হচ্ছে না এতটুকুও, কিন্তু বসে আছে। শুধু এটুকু জানার জন্য, ওদিকেও কেউ আছে। এবার তা হলে


ছোট, বড় সবার।
স্পোর্টস্ ও ক্যানভাসের বিশাল সম্ভার।
আর দাম, পুরোপুরি সাধ্যের মধ্যেই।
Sreeleathers
KANVAZ
ফ্যাশন দুনিয়ার নতুন প্যাশন
28513
Rs 748/-
Genesis 2878
Sreeleathers
বিশ্বমান। খাঁটি দাম।
Lindsay Street 033 22861510/11 Free School Street (Opp. Fire Brigade) 033 22861506

রাখি। আচ্ছা। অন্যপক্ষ সম্মতি দেয়। বহুক্ষণ কেটে যায়। কেউ আগে ছাড়ে না। ছাড়তে নেই। তা হলে হেরে যাবে না! জোছনা ফের ঝলমল করে ওঠে। তারারা ঝিকমিক। যক্ষের মতো গুপ্তধন আগলায় টেলিফোন। কোনও ক্রস কানেকশন তাল কাটেনি মধ্যমে।

একটা টেলিফোনকে ঘিরে তখন আশা-আকাঙ্ক্ষার ঘরবসত ছিল। বাড়িতে বেজে উঠলে, সেটা যে কার, তা নিয়ে বুকের ভেতর হুড়ুমদুড়ুম চলত। যে-ফোনটা আসার কথা ছিল, সেটা কি আমি ধরার আগেই বাবা-কাকা ধরে ফেলবে—তাই নিয়ে নিরন্তর টেনশন ছিল। সারাটা বিকেল একটা ফোনের জন্য বহু হা-পিত্যেশও ছিল। যদি আসে যদি আসে। আমাদের বাড়ির ফোনের সঙ্গে সায়েন্স কলেজের ফোনের একটা তুক ছিল। দিনের মধ্যে অন্তত চারটে ফোন তো আসতই সায়েন্স কলেজের। বাড়ির বড়রা এমন ফোন ধরে খুব খানিক বিরক্ত হতেন আর আমরা ভাইরা বিস্তর মজা পেতাম। সায়েন্স কলেজের ফোন এলেই সেটা ছিল আমাদের কাছে খেলা বিশেষ। একজন বলত, হ্যাঁ, কাকে চাইছেন, ধরুন। বলে, সে রিসিভার উল্টিয়ে কেটে পড়ত। কোনও কোনওদিন আমরাই সব প্রখ্যাত অধ্যাপক, বিজ্ঞানী সেজে যেতাম। কথাবার্তা কিছু দূর গড়ানোর পর, তাঁরা আমাদের বাপান্ত করতে শুরু করতেন। আমরাও ফোন-টোন রেখে দুদ্দাড়িয়ে ধাঁ। যাঁরা ফোন করতেন, তাঁদের অনেকেই মহাদেববাবু বলে একজনকে চাইতেন। সম্ভবত তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের অফিসকর্মী ছিলেন। আমরা বলতাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহাদেববাবুকে ডেকে দিচ্ছি। তারপর গলা নকল করে চালু করতাম শ্রুতিনাটক। কাউকে কাউকে বলতাম, মহাদেববাবু আর সায়েন্স কলেজে নেই, উনি কৈলাস চলে গিয়েছেন চিরতরে।

এ-ও এক ধরনের ক্রস কানেকশন। 'সাড়ে চুয়াত্তর' সিনেমাটি যেমন শুরু হয় বেমক্কা গোলোযোগ ফোন দিয়ে। তেমন ধরনের। এই ভুল ফোনের মজা গোটা গরমের ছুটি আমাদের অফুরান হাসি দিয়েছে। একখানি গম্ভীর নিরেট যন্ত্র থেকে যে অত হাসি ছিটকে বেরতে পারে, ধারণাও করিনি কখনও। কত ভদ্রলোকের মেজাজ চড়িয়ে দিয়েছি, কত জ্ঞানী মানুষকে খামোকা হ্যারাস করেছি, কাউকে কাউকে প্রেশারের ওষুধ খেতেও বাধ্য করেছি কি না কে জানে!

কালো টেলিফোনের সত্যি সত্যি একটা ওজন ছিল। সুসংবাদ-দুঃসংবাদের ভার নিয়ে বিগ্রহের মতো অধিষ্ঠান করত সকল মধ্যবিত্ত-ঘরে। তার স্থানটি নির্দিষ্ট। ফঙ্গবেনে কর্ডলেস বা মোবাইলের মতো সে এ-ঘর ও-ঘর করত না কখনও। জাঁদরেল জমিদারের মতো তার সিংহাসনটি অটুট ছিল তখনও। রিসিভারটিও অনেকক্ষণ ধরে থাকলে কনুই টনটন করত, বেশি কথা বললে কানও। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবির আবহ তৈরি করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় দেখেন, মগনলাল মেঘরাজের আম্বাসাডারের দরজা বন্ধ করার শব্দটি আর কিছুতেই মনোমতো হচ্ছে না। স্টুডিওতে গাড়ি ঢুকিয়ে তো আর দরজা বন্ধ করার আওয়াজ রেকর্ড করা সম্ভব নয়। অগতির গতি হিসেবে সেদিন কাজ করেছিল ওজনদার কালো টেলিফোন। ভারী রিসিভারটিকে ঘটাং করে রাখার শব্দটি তোলার পরিকল্পনা জিনিয়াস পরিচালকের। ছবির সঙ্গে খাপে-খাপ মিলেও গেল তা। এমনি কত শত বাংলা ছবিতেও কথা বলেছে টেলিফোন। মৃত্যুপথযাত্রী নায়ক বা নায়িকা সংলাপ বলতে-বলতে ফৌত হলেন, রিসিভারটি প্যাঁচ খাওয়ানো তার-সমেত ঝুলে পড়ল নীচে, অন্তিম ক্লাইম্যাক্সের এমন দৃশ্যে দুর্দান্ত অ্যাক্টো দিয়েছে টেলিবন্ধু, সবসময়।

বিড়ালের প্রাণ ন'বার, টেলিফোনের প্রাণ অনন্ত। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতাম, বাড়িতে শোরগোল লেগে গিয়েছে জোর। এই দেহ রাখলেন মহারাজ। টেলিফোন ডেড। নিষ্প্রাণ, নিশ্চুপ। কানছিপি ধরে যতই টিপুনটাপুন, ডায়ালটোন আর আসার নয়। কিছুক্ষণ টেলিফোন কোম্পানির শ্রাদ্ধ হল, কিছুক্ষণ অকারণে জ্যোতিবাবুর মুণ্ডপাত—কিছুতেই কিছু হল না। টেলিফোন যেমন-কে-তেমন। বোবাদৃষ্টি নিয়ে সে দিন দুই কাটাল। মদন একাই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করল কাঁচালঙ্কার তেজে, মুখে গুলক দিয়ে টেলিফোন বসে রইল নববধূর মতো। তারপর এক সকালে কী মতি হল কে জানে, বাড়িভর্তি খুশির রোদ্দুর, পাওয়া গিয়েছে, পাওয়া গিয়েছে। ডাক্তারের পাল্‌স পেলে যেমন আনন্দ হয়, হারিয়ে-যাওয়া কানের দুল হঠাৎ খুঁজে পেলে যেমন সেলিব্রেশন—ডায়ালটোন পাওয়া গিয়েছে। একই পজিশনে যদিও সে অনড়, তবু চলছে। ধক ধক ধক ধক চলছে।

প্রতিটি কিশোরের বয়সকালের একটা গলাভাঙা থাকে। হাঁড়িচাচা-সদৃশ কণ্ঠ, বেয়াড়া ব্রণ—এসব নিয়ে ভারি বিব্রত থাকতে হত। ঘসঘসে গলাটি ভদ্দরলোকের মতো হবে তো, এই প্রত্যাশায় প্রত্যেকে গোপনে আমরা ব্যারিটোন প্র্যাকটিস করতাম। মকশো করার প্রধান হাতিয়াড়টি ছিল ওই টেলিফোন। কতরকম কায়দায় যে 'হ্যালো' বলতাম। গলাটা যতটা সম্ভব খাদের দিকে ঠেলে, প্রায় দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে, মেঘমন্দ্র হ্যালো। অচেনা কারুর ফোন হলে ওই বেসটাই দেওয়ার চেষ্টা করতাম প্রাণপণ। ফোন হাতে আমি যেন গুরুত্বপূর্ণ এক অফিসার, সুকণ্ঠে টপটপ করে ঝরে পড়ছে দায়িত্বকণা। গলাবাজির প্রথম পাঠ কালো টেলিফোনের কাছে, হারানো দিনের ভাঁড়ানো কিছু স্বরলিপি হাতে আমিই সেই ফোন-ই-ভূষণ।

আমাদের বাড়ির কালো টেলিফোনটি কবে চলে যায় ঠিক মনে করতে পারি না। তবে ওই অ্যান্টিক-টিকে টেলিফোন আপিসে জমা করে, বদলে পেয়েছিলাম আঙুলটিপ, প্লাস্টিক ফোন। তখন মনে হয়েছিল, ও প্রাম্ভারি গোবদা ফোন বিদেয় হলেই ভাল। কোনও স্মার্টনেস নেই, দাদু-টাইপ। নতুন ফোন ঝকঝকে তকতকে ছিমছাম। ফুরফুরে ও হালকা। কত অত্যাধুনিক আয়োজন তার সর্বাঙ্গে। তাই কালো ফোনটি বাতিল হল। এবার সত্যি-সত্যি সে দেহ রাখল সকলের অগোচরে। কত জন্ম-মৃত্যু-আঘাত-ভালবাসা বয়ে নিয়ে এসেছে সে আজীবন, তার চলে যাওয়া আমাদের একবারটিও মনে পড়েনি। বরং আগ বাড়িয়ে আমরাই পড়শিকে জানিয়েছিলাম, জানো তো, নতুন একটা ফোন এসেছে আমাদের। যে রাতগুলোয় ফোন ছুঁয়ে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, যে কান্নাগুলো সব শুষে নিয়েছিল রিসিভারের হাতল, যে গল্পগুলো দুর্ভাবনায় প্যাঁচাতে থাকত কাপড়মোড়া তারটিকে—আর কখনও, একটুও পাত্তা দিইনি তাকে। এখন আর ফোন বাজলে পৃথিবী তোলপাড় করে ছুটে যেতে হয় না আমাকে, আজকাল ফোনই আমার কাছে আসে। আমি জানি কে, কারা, কবে, কখন। নিকষ কালো অন্ধকারটায়, বেতের টুলে আমি আর বসে নেই অনেকদিন।

হয়তো বা স্বপ্নেই, কিংবা অন্য কোনও অচেতনে, খুব ভিড়ে বা নিঃসীম ফাঁকা বড় রাস্তায় ওই ফোনটা বেজে ওঠে। পুরনো শব্দ নিয়ে গলাখাঁকারি দেয়। আমি আনমনে উঠতে যেতেই, একতলা থেকে খাঁচার পাখি ডেকে ওঠে—তুই-ই কে-এ-এ...তুই-ই...কে-এ-এ-এ? আমি বেকুবের মতো চারপাশ তাকাই। বুঝতে পারি, অন্য লাইন, অন্য লাইন ছিল সব। বোকার মতো আবার ক্রস কানেকশন করে ফেল্লাম। কাকুতি-মিনতি করতে থাকি, প্লিজ লাইনটা ছেড়ে দিন, একবার ছেড়ে দিন, আমায় ছেড়ে দিন, আমি এই পাড়ায় আসার আর কোনও চেষ্টা করব না, সত্যি বলছি।

কালো টেলিফোন, মদন, দাদুদের কথা আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়ে। নিশ্চয়ই ওদেরও মনে পড়ে আমার কথা। এমন ফোন প্রায়ই আসে, যখন অপর প্রান্ত থেকে কোনই শব্দ পাওয়া যায় না, অনেকবার হ্যালো হ্যালো-র পরও না, খুব সন্দেহ হয়, ওরা সকলে মিলে আমার সঙ্গে, এই অবেলায়, দারুণ মজা করছে না তো!

না-মানুষের পাঁচালি



মানুষ সাপকে এত ভয় করে যে, ষাট-সত্তর বছর আগে সন্ধ্যাবেলায় ফিসফিস করে লতা-লতা বলত। সাপ উচ্চারণ করত না। প্রকৃতির আশ্চর্য সৃষ্টি সাপ। মরুভূমির বালিতে, জলে, খানা-খন্দে হাত-পা হীন সাপ মসৃণ গতিতে অগ্রসর হয়। তার দ্বিখণ্ডিত জিভ পায় ১৮ মাইল দূরের খাদ্যের ঘ্রাণ। রাত্রের অন্ধকারে পরিবেশের থেকে খাদ্যপ্রাণীর শরীরের তাপমাত্রা বুঝে নিয়ে নিমেষে গিলে ফ্যালে। বাতাসের কম্পন সে বোঝে তার শরীর দিয়ে। সাপ যে মানুষকে মোহিত করতে পারে, অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট, ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল দেখলেই তা বোঝা যায়। এমনও সাপপ্রেমিক আছেন, যাঁরা সাপের গা থেকে পোকা বার করতে করতে আপনাকে অনুকম্পার সুরে অনুরোধ করবেন সাপের গা থেকে পোকা ফেলে দিতে। ওদের হাত নেই, পোকাগুলো ওদের বড় কষ্ট দেয়। মনে পরে শিবপ্রসাদ বাঁড়ুজ্যের কথা। দক্ষিণ কলকাতার ব্রহ্মপুরে উনি থাকতেন। দশ বছর আগে ব্রহ্মপুর গ্রামই ছিল। সেখানে শিববাবু ফল-তরকারি নিয়ে গবেষণা করতেন। তরকারির স্বাদ বাড়াতে



তাদের মধ্যে অন্য তরকারির স্বাদ, রং দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আট-দশ কেজির এক একটা পালংশাক করেছিলেন। বাজারে "ব্যানার্জি'স জায়ান্ট" বলে বিক্রি হত। পলিফ্লাওয়ার নামে একটা ফুলকপি করেছিলেন। একটা ফুলকপি কাটলে পোঁতা গোড়া থেকে তিন-চারটে কপি হত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উনি ডক্টরেট উপাধি পেয়েছিলেন। শিববাবু সরকারি অনুদানের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন। এই সিধাসাধা মানুষকে সবাই সম্মান করতেন, কিন্তু অনুদান জোগাড় করতে উনি পারেননি। তাঁর গবেষণার ফল সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শিববাবুর আশেপাশের খেতে ইঁদুররা তাঁর চাষের কোনও ক্ষতি করে না। তাঁর খেতে সাপেরা শান্তিতে বসবাস করে। খাজনা হিসেবে তাঁর খেত ইঁদুরমুক্ত রাখে। একদিন দেখেছিলাম শিববাবু একটা গাছের নীচে বসে নিবিষ্ট মনে লিখছেন। পাশে একটা সাপ গোল পাকিয়ে রয়েছে। শিববাবু বলেছিলেন, 'ও আমাকে চেনে। আমরা এখানে বসে রোদ পোয়াই।' কুকুর-বিড়াল পুষে মানুষ যেমন মায়াজালে জড়িয়ে পড়ে, সেরকম একই মায়াজালে মানুষ জড়িয়ে পড়ে সাপ পুষেও। চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি মহারাজ স্নেহাংশু আচার্য, যাঁর অনেক রকম পশুপাখি ছিল, তাঁর একটা পোষা সাপও ছিল। তাঁর নিজস্ব ঘরে ঘুরে বেড়াত। কখনও কখনও কাছে এসে হাঁ করলে উনি একটা ডিম দিতেন। সাপপ্রেমিক মাত্রই বলেন, সাপ নিরীহ, অসহায়, শান্ত। ভুলে যাই যে ব্ল্যাক মাম্বা, যে সাপ আমাদের দেশে নেই, সেই সাপ ছাড়া কোনও সাপই তেড়ে এসে কামড়ায় না। সব সাপের বিষ নেই। সাপের সামনে নাচানাচি না করলে, সে তার পথ দিয়ে চলে যাবে। মানুষ তার খাদ্য নয়। যে সাপের বিষ আছে, সে তার বিষ অখাদ্যের ওপর নষ্ট করবে না। সাপ সম্বন্ধে আমাদের এত ভয় যে তার সম্বন্ধে আমরা জানতেও চেষ্টা করি না। যে ইঁদুর শস্যের ক্ষতি করে, এত রোগ ছড়ায়—পেঁচা প্রভৃতি পাখির মতো সাপও তাদের বিনষ্ট করে। মানুষের বন্ধু সাপের প্রতি আমরা সহানুভূতির হাত বাড়াই না। বীরপুরুষ হয়ে পিটিয়ে মারি। সব বন্য পশুপাখির মতো সাপও মানুষকে ভয় পায়। অ্যানিম্যাল প্ল্যানেট-এ দেখলাম আমেরিকায় ব্ল্যাক ডায়মন্ড র‍্যাট্‌লস্নেক-এর কামড়ে বছরে দুই বা তিনজনের মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রতি বছর চামড়া আর র‍্যাট্‌লের জন্য ২০০০ মতো র‍্যাট্‌লস্নেক মারা হয়। যে ইঁদুরকে এত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সত্ত্বেও, আজ পর্যন্ত নির্বংশ করা তো যায়ইনি—সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যায়নি, তা করতে প্রকৃতি সক্ষম হত, যদি না ফুড চেন আমরা নষ্ট করে দিতাম। চতুর্দিকে আবর্জনার পাহাড় করে আমরা ইঁদুরের বংশবৃদ্ধির সুযোগ করে দিয়েছি। খাদ্যের অভাব তাদের হয় না। খাদ্যপুষ্ট মা ইঁদুর বছরে আট থেকে দশবার আটটি বা দশটি বাচ্চার জন্ম দেয়। চার মাসের মধ্যে তারা আবার জন্ম দিতে পারে। পৃথিবী আর প্রকৃতিকে অধিকারের প্রতিযোগিতায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়েও আমরা জয়লাভ করতে পারছি না। ধ্বংসের মুখে যাচ্ছি। আমাদের বন্ধু বাজপাখি, পেঁচা, সাপকে কি আমরা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করব? পরের প্রজন্মের কথা কি ভাবব? পশুপাখিদের দিকে কি বন্ধুত্বের হাত বাড়াব?

হ্যাঁ, সাপ কিন্তু দুধ-কলা খায় না। মনসাপুজোয় যখন তাকে জোর করে দুধ গিলিয়ে দেওয়া হয়, তখন সেটা তার মৃত্যুদণ্ডের সামিল।



রোববারের ক্রমশ

অষ্টম গর্ভ

বাণী বসু

ষষ্ঠ অধ্যায়

সন্দীপনে সমাবর্তন

জন্ম দাও হে পৃথিবী। বীজ, মাটি, জল, শস্য সব দাও। তোমাকে খুঁড়ে খুঁড়ে দীর্ণ করে দেয় তোমার সন্তান, করে চলে যায়, ভাবে না তোমার প্রতি তারও কর্তব্য আছে। ভালবাসার উত্তরে যখন ভালবাসা নেই তখন তুমি মুদিতনয়না, নিশ্চেতনা, তোমার আকাশ, তোমার বৃক্ষ, তোমার নদী ও গিরিযূথ সমস্ত তোমার আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। শুদ্ধু তাদের জন্য, যাদের তুমি বহু কোটি বছরের গর্ভধারণের পর জন্ম দিয়েছ।

তখন রাত। আমার চোখ আর মনের ওপর থেকে একটা ঢাকনা খুলে ঠংঠং করে পড়ে গেল।

চোখ মেলে যখন সেই রাত, সেই সকাল, সেই চাঁদ, সেই সূর্যের দিকে চাইলুম তখন সব বদলে গেছে। গল্পকথার লৌহ মুখোশ বুঝি পরানো ছিল, এক টানে সে মোহ আবরণ কে সরিয়ে নিয়েছে। বাবার দিকে চেয়ে দেখি ইনি এক দুর্গাপ্রসাদ সিংহি, নেহাতই দুগগি একজন, একেবারেই অপরিণতমন, জানেনই না তাঁর কোনও পরিণত মনস্কতার দিকে যাওয়ার ছিল। সমস্ত বিপ্লব, আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, তথাকথিত ত্যাগ, ভোগ, প্রতিভার ভেতরে আদ্যন্ত ছেলেমানুষ, অথচ নিজেকে ভারিক্কি মনে করা একটি মানুষ। খুলে গেল সুভাষচন্দ্রের পোশাক, বিদ্যাসাগরের চটি আর বিবেকানন্দের পাগড়ি ইন্দ্র সিংহর দেহ থেকে, পড়ে রইল একজন সামান্য মানুষ ইশ্বরদত্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে যে কাজে লাগায়নি, সরে গেল সারদামণির ঘোমটা ঋদ্ধিদিদির মাথা থেকে, মুছে গেল লীলাবতী গার্গীর রূপটান ভক্তিদিদির মুখ থেকে, পড়ে রইল দুই জেদি, মোহগ্রস্ত মনস্বিনী জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ব্যর্থ যাদের মনীষা, যে স্নেহমমতাময় সূর্য সিংহকে জানতুম, সেও স্বর্গের অশ্বিনীকুমারের ভূমিকা খোলসের মতো ছেড়ে মাটি কাদার পৃথিবীতে নেমে পড়ল, জানিয়ে দিল স্নেহ মমতা কোনও অ্যাবসলিউট নয়, নেহাতই আপেক্ষিক ব্যাপার।

তখন তো এত বিশ্লেষণ করতে পারিনি। সেটা বোধহয় এখন করছি। তখন যেটা হয়েছিল সে এক বড় আজব অনুভূতি। আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। এক এক জন করে আসছে। ঠিক যেন মঞ্চের অভিনেতারা সাজসজ্জা ছেড়ে, মেক আপ তুলে বেরচ্ছে। নেই মাথায় মুকুট, আকর্ণবিস্তৃত চোখ, ভুরু, জরির পোশাক, মিথ্যে জড়োয়ার গয়না। সাজঘরে পড়ে আছে টিনের মুকুট, রাংতার গয়না, টিনের তলোয়ার। তুই বোধহয় কোথাও লুকিয়ে পড়েছিলি, ভেবেছিলি মা মরেই গেছেন, ঠাকুরদার মতো ঠাকুমার মতো, এই মৃত্যুকে ভীষণ ভয় পেতিস তুই। আমারও ভয় হয়েছিল। কিন্তু মাকে হারানো আমি অত সহজে মেনে নেবো না তো! যমকে একটা লড়াই দিতে ছোট্ট বুবু তার ছোটি ছোটি হাত নিয়ে রেডি ছিল। মায়ের মাথার কাছ থেকে আমি এক লহমার জন্যেও নড়িনি।

বাবা নাড়ি দেখছিলেন, টমদিদি মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছিল, সুযযি পায়ের কাছে বসে নির্নিমেষে চেয়েছিল। বাবা ওষুধের নাম বলতেই দৌড়ে নীচে চলে গেল। পমদিদি একটু দূরে বসে চোখ বুজিয়ে জপ করছিল, এবং মুক্তানন্দ ঠাকুর গোলেমালে উঠে পড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। আশেপাশে গলসি, নদিয়া বাঁকুড়ার ভিড়। উনি বললেন—সরো, সরো, পথ দাও, পথ আটকে আছো কেন? ওঁর কণ্ঠ কর্কশ, গেরুয়া সিলকটা বুক পর্যন্ত বাঁধা নেই, কোমরে নেমে এসেছে। বুকময় বিচ্ছিরি ঘন লোম। কপালের তিলকসেবা মুছে গেছে। আমার কেমন মনে হল বর্মার জ্যাঠামশাই ঢুকছেন, ভেতরটা কেমন গুলিয়ে উঠল, আমাকে যা করেছিলেন আমার মাকেও কি তাই করবেন ইনি? মায়ের মাথার দিকে ওঁর থাবাটা এগিয়ে আসছে, মুখে ওম ওম। আমি শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে ধাক্কা দিলুম, হাতটা সরে গেল, মায়ের মুখের ওপর আমি আধ-উপুড়; তাজ্জব বনে আমার দিকে সব তাকাচ্ছে, বুঝতে পারছি, কেন না মাকে বাঁচাতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে এখন চোখ বেরিয়েছে। উনি বললেন—থাক ছেলেমানুষ! মা তো! ওম ওম ওম।

সুযযি দৌড়ে এল নীচ থেকে। বাবা ওষুধ দিলেন। কে যেন বলল—আপনার চরণামেত্তো একটু দিন না ঠাকুর। মা নিশ্বাস ফেলে ও পাশ ফিরে শুলেন। চোখ তেমনি বোজা, কিন্তু ঘোরটা বোধহয় কাটিয়ে উঠেছেন। ততক্ষণে পিসিমা হাজির। এক কাপ দুধ নিয়ে উনি এগিয়ে এলেন, খ্যান খ্যান করে বললেন—সারাটা দিন বৌটার পেটে কিছু পড়েনি, সবাই খেয়ে দেয়ে এই কাপ দুধ বাকি আছে, আপনারা সরুন, আমি খাইয়ে দিই। টম মুখে যত খুশি জল ঢেলেছ মুছিয়ে দাও, ফিডিং কাপটা বার করো দিকি। আপনারা সরুন, একটু সরুন!

পিসিমার মুখ থেকে থান-কাপড়ের ঘোমটাটা সরে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে কালো আব-ওলা ছোট্ট ন্যাড়া মাথা, ফিডিং কাপে করে একটু একটু করে দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করছেন পিসিমা, মা গিলতে গিয়েও গিলছেন না।—আপনারা সরুন এ ঘর থেকে, নইলে উপোসী বৌটা খাবে না, আপনাদের ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে। সবাই পেছোচ্ছেন এবার, এখন খালি আমরা ভাইবোনেরা আর বাবা।

পিসিমা কড়া গলায় বললেন—পম তোমার জপতপ ও ঘরে গিয়ে করো গে যাও। যতি বলো কেন তো আমার রাগ ধচ্চে জেনো। দুগগি, হাতটা ছাড়ো। নাড়ি দেখতে কতক্ষণ লাগে?

তারপর দুধটা ফোঁটা ফোঁটা করে মায়ের গলার ভেতরে চলে গেল।

চোখ এখনও বোজা। আর এক ডোজ ওষুধ দিলেন বাবা, বললেন—ভয় নেই, এবার ঘুমিয়ে পড়বে। পিসিমা এবার দ্বিগুণ ঘ্যানঘ্যান স্বরে বললেন—আপনারা মেয়েরা কে কে আছেন, নীচে চেম্বার ঘরে বিছানা করে নিন। খাবার ঘরেও জায়গা করা যাবে। ব্রহ্মচারীজি আপনি শুয়ে পড়ুন গে যান আর দিক করবেন না, যদি বলেন কেন তো আপনি কি ডাক্তার না নার্স?

আমাদের বাড়ির এই তিন জ্যেষ্ঠা মহিলাকে একবার পেছন ফিরে দেখা যাক। একই বাড়িতে বসবাস, একই পরিবারের গণ্ডির মধ্যে, অথচ দ্যাখ, প্রত্যেকটা মানুষের আলাদা চরিত্র, আলাদা প্রতিক্রিয়া, আলাদা ভূমিকা। কোনও ভূমিকা সমাজ বা পরিবার ঠিক করে দিয়েছে, কোনওটা আবার মানুষটি নিজেই ঠিক করে নিয়েছেন। এই শেষোক্ত দলে পড়তেন আমাদের ঠাকুমা। সমাজ তো তাঁকে গৃহিণীর রোলই দিয়েছিল, কিন্তু তিনি সেটাকে বদলে নিলেন। কেন, কী পদ্ধতি ব্যবহার করে বদলালেন? সচেতন ভাবে নিজের আশপাশের মানুষগুলির বিশ্লেষণ করেছিলেন? নাকি ইনটুইশন? বোধহয় ইনটুইশনই। কিন্তু ঠাকুমা মনোমোহিনী যে খুবই বুদ্ধিমতী ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর গৃহিণীপনা ছিল খুব সীমাবদ্ধ। ঠাকুরদার ঘরের বাইরে তিনি আর কোনও কর্তৃত্ব রাখতে চাননি। এ নিয়ে মনোর সঙ্গে বিবাদ করতে তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। এই গৃহিণীত্বের লোভ ছাড়া কিন্তু খুব সহজ কাজ নয়। তখনকার দিনে মেয়েদের হাতে ওই গৃহিণীত্ব ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রই বা ছিল? কিছু না কিছু আকাঙ্ক্ষা তো মানুষের থাকেই যার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা যায়! তাঁর ছিল সৎসাহস, যাকে বলে মরাল কারেজ। তারই জোরে তিনি দুগগি আর তার বাবার গরমিলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতেন অকুতোভয়ে, প্রয়োজন হলে ঠায় সেবা করার দায় নিতেন অতি সহজে।

সংসারের টাকা আনা পাইয়ের দিকে তাঁর একেবারেই নজর ছিল না। কিন্তু হৃদয়ের জগতে, মনের জগতে তাঁর বিচার বিচক্ষণতা ছিল প্রশ্নের বাইরে পরিবারের সূক্ষ্ম ব্যালান্স অব পাওয়ারে তাঁর ভূমিকাটা ছিল সূক্ষ্মতর কিন্তু অপরিহার্য। ব্যালান্সের কাজটা তিনি কিন্তু করতেন স্বাভাবিক বুদ্ধি ও হৃদয় দু'টো দিয়ে, কোনও তোষামোদ বা চতুর ডিপ্লোম্যাসির পথে নয়। আসলে প্রত্যেক মানুষের যেমন কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষা কর্মৈষণা থাকা উচিত, তেমনি থাকা উচিত কিছুটা নিরাসক্তি। খুব জোর করে কেউ তোমার কাছ থেকে কিছু কাড়তে চাইছে? ঠিক আছে, ছেড়ে দিলুম। তার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই কিছু চাই। মনোমোহিনীর ক্ষতিপূরণ ছিল বই, বিশেষত নভেল। কতদিনই বা সঙ্গ পেয়েছিলুম ঠাকুমার, তারই মধ্যে 'গোরা', 'চরিত্রহীন', 'বামুনের মেয়ে', 'রাজসিংহ', 'যোগাযোগ', আরও কত নভেলের নাম মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অনেক জায়গা পড়ে শোনাতেন ঠাকুমা। যেমন কুমুর রূপবর্ণনা, অন্তঃপুরে চঞ্চলকুমারী ও তসবিরওয়ালির এপিসোড, 'মহেশ' গল্প, রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্প। পড়ে শোনাতে শোনাতে একেবারে তদ্‌গত হয়ে যেতেন ঠাকুমা, খানিকটা অভিনয়ও করতেন, কণ্ঠস্বর উঠত নামত। মনোমোহিনী অন্য জীবনে বাঁচতেন। বেশ উপভোগ করেই বাঁচতেন। আমাদেরও তার কিছুটা স্বাদ ওই অল্পসময়ের মধ্যেই দিয়ে যেতে পেরেছিলেন।

মা ছিলেন পরিশ্রমী, সুগৃহিণী, তাঁর নিজের নম্র স্বভাবের সঙ্গে মানিয়ে সাহসিনীও, কেন না তিনি এমন নৌকার যাত্রী ছিলেন যা ভাঙা, মাঝি দাঁড় বইতে পটু নয়, হালটি তিনি ধরে ছিলেন। তাঁর সব দিকে নজর। তিনি আমাদের আশ্রয়। কিন্তু গৃহিণী অথচ কর্ত্রী নয়, এই প্যারাডক্স তাঁর জীবনে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। অর্ধেক এ দেশি মেয়েদের জীবনে এই প্যারাডক্স সইতে হয়। দায়িত্ব আছে, কর্তৃত্ব নেই। জীবন যখন শুরু করেছিলেন তখনও ছিল, ছেলেমেয়েরা যতই বড় হল তারা কর্তৃত্বগুলো দখল করতে লাগল। তাদের বুদ্ধি বেশি, পড়াশোনা বেশি, ব্যক্তিত্বও সেই অনুযায়ী বেশিই হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পম আমাদের স্কার্ট পরিয়ে, বব চুল আঁচড়ে একটা সিঁদুর টিপ পরিয়ে দিল, পুটপুটদিদির কী লজ্জা! কী বিশ্রী দেখাচ্ছে, একেবারে কিম্ভূত, আমি নেহাত ছোট অত বুঝতে পারি না, কিন্তু পমদিদি ভাবের ঘোরে আছে, কোন বিশ্বজননীর কপালের স্পিরিচুয়াল টিপ তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে কে জানে, কন্যাসমা ছোটবোনেদের কপালের সিঁদুরটিপে সে ভোর হয়ে আছে।

—মা, ওমা, দ্যাখো না পমদিদি কী বিশ্রী টিপ পরিয়ে দিয়েছে। ফ্রকের সঙ্গে কেউ টিপ পরে নাকি? পুটপুট মাকে বলছে।

মা একবার ঘুরে তাকালেন, আমার খুব সন্দেহ মুখে সামান্য হাসি লুকিয়ে ছিল, তাড়াতাড়ি সেটা লুকিয়ে বললেন—পমদিদি পরিয়েছে? ভাল লেগেছে বলেই নিশ্চয়ই পরিয়েছে।

নিজের থেকে মাত্র সতেরো বছরের ছোট মেয়ের এই কর্তৃত্ব তিনি মেনে নিলেন। ভেতরে ভেতরে মেয়েকে সম্মান জানাবার ইচ্ছা তো ছিলই, সেই সঙ্গে বোধহয় এও জানতেন না মেনে নিয়ে কোনও উপায় নেই। আমার মনে হয়, মা একটু চ্যালেঞ্জ জানালে পারতেন, অন্তত এই সব ছোটখাটো বিষয়ে নিজের মতামতটা কেন জানাতেন না সে এক বিস্ময়। বাবার প্রতি সূক্ষ্ম অভিমানে কী?

পিসিমা মনোরমা কিন্তু হয়ে দাঁড়ালেন মায়েরও আশ্রয়। এ কথা সব সময়ে বোঝা যেত না, বোঝা যায়নি। দু'জনে নীরবে যুক্তি করে সংসার চালাতেন, কাউকে কিছুই জানতে দিতেন না, মায়ের হিসেবনিকেশ ব্যবস্থাপনা আর মনোরমার রন্ধনপটুত্ব এই দুই নিয়ে গড়ে ওঠা একটা গোপন ইউনিট। পিসিমা যেন কত ধানে কত চাল কিচ্ছুটি জানতেন না, সব দেব জানে, তিনি শুধু চটুর ওপর নিরবচ্ছিন্ন পরোটা উল্টে যাচ্ছেন, দেবু বলেছে, সরুচাকলি করা হোক, তো তাই, মনোরমা গোটা দুই বেগুনের বোঁটা নিয়ে রাশি রাশি সরু চাকলি ভাজতে প্রস্তুত। পৌষ প্রখর শীতে জর্জর, পিঠে হবে, দেব বললেন, পিঠে যা হচ্ছে হোক, রাত্তিরবেলার জন্য একটু সামান্য নিরামিষ ঝোল ভাতের ব্যবস্থা থাক। ব্যস, দু'জনে মিলে সারাদিনের খাটুনির পরে, রান্নাঘর ধুয়ে মুছে, চান টান করে পিঠের গোলা নিয়ে বসে গেলেন। সেদ্ধ পুলি, মুগসামালি, পাটিসাপটা, মালপো, কড়াইশুঁটির নোনতা ভাজা পিঠে, রসবড়া। মিষ্টি পিঠে ক'দিন থাকবে। যে দিন কড়াইশুঁটির কচুরি আর আলুর দম হবে সেদিনই একমাত্র রাতে আর কিছুর পাট নেই। ঋদ্ধি বিদ্যা রসে ফেলা খাবার খায় না, সূর্য অংশু রসবড়ার দারুণ ভক্ত, ভক্তি শ্রদ্ধা নোনতা পছন্দ করে, এই সমস্ত মাথায় রেখে এক অদ্ভুত প্রকাণ্ড কাণ্ড। শীতের বিকেলে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখব একটি পুরো ময়রার দোকান বসে গেছে, হাঁড়ি ভরে, গামলা ভরে, পরাত ভরে থরে থরে পিঠে-পার্বণ। সব দেবুর ব্যবস্থাপনা ঠিক আছে, কিন্তু সংকটকালে বিশেষত যে সংকট দেবুর সংকট, তার হাত থেকে হাল পিছলে যাচ্ছে, তখন সেই হাল শক্ত হাতে ধরার ক্ষমতা তিনি রাখতেন।

এই ভূমিকায় তাঁকে আগে আমরা দেখিনি সেরকম সময় আসেনি বলে। কিন্তু সেদিন তিনি নির্ভীক হাতে সেঁচে ফেলেছিলেন নৌকার খোল ভর্তি জল, হাল ধরেছিলেন, দাঁড় বাইতে বাধ্য করেছিলেন মাঝিদের সেই কূলকিনারাহীন মাঝদরিয়ায়।

পরদিন সকাল আটটার মধ্যে বাড়ি খালি হয়ে গেল। টম আর পুটপুট সবাইকে চা করে দিল, বিস্কুট দিল। শিষ্যসমভিব্যবহারে ঠাকুর ট্যাক্সিতে উঠছেন, বাবা করুণ নয়নে বলছেন—যদি শ্রীচরণে কোনও অপরাধ করে থাকি মাফ করে দেবেন।

পিসিমা ঘ্যানঘ্যান করে বললেন—ও কী কথা! এতদিন ধরে গায়ে খেটে, গেরস্তের যা কিছু সঞ্চয় নিকেশ করে সেবা করলে এখনও অপরাধের কথা তোমার মনে ওঠে কী করে দুগগি? ব্রহ্মচারীজিকে এ সব কথা বলে পাপের ভাগী করো না।

মৃদুমধুর হাসলেন ঠাকুর, ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

কিন্তু এরপরে পিসিমা যা করলেন তা আরেক বিস্ময়। তিনি বললেন—দেবু যদ্দিন সুস্থ না হচ্ছে আমি রান্নাঘরে যেতে পারব না। পম টম তোমরা চালিয়ে নাও।

—সে কী পিসিমা! মায়ের সেবা আমরাই করতে পারব! টমদিদি বলল।

—তা হয় তো পারবে মা, কিন্তু তাতে আমার মন উঠবে না জেনো। তাছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা লেখাপড়া আর শাস্ত্র পুঁথি, ভগবান আর ঠাকুর দেবতা এই নিয়ে রয়েছ, একটা এত বড় সংসার কী করে চলে তোমাদের জানা চাই। আর দুগগি শুনে রাখো, চাল ডাল মশলাপাতি যা আছে আর দিন দুই চলবে। বাজার করার টাকা নেই। যতি বলো কেন, তুমি ভক্ত হয়ে থেকে চেম্বার বন্ধ, কোনও আয় হয়নি। তোমাদের ঠাকুরের সেবায় দীয়তাং ভুজ্যতাং—এ দেবুর তোলা চুড়ি চারগাছ্ গেছে। তোমার হয় তো লজ্জা নেই, আমার আছে, দুঃখু শোকের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম।

বলে টলে পিসিমা মায়ের মাথার কাছে জানলার ধারে উবু হয়ে বসলেন ছোট্টখাট্ট একটি রূপী বাঁদরের মতো। সংকল্পে এমন স্থির, হালটি এত কঠিন এমনকী রূঢ় হাতে ধরেছেন যে মনে হচ্ছে এ পিসিমা সে পিসিমা নয়। তাঁর মাথার কালো আবটাকে আমরা আরও ছোটবেলায় ভাবতুম—যাদু বোতাম। টিপলেই রূপকথার গল্পের মতো পিসিমা টিয়েপাখি হয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে উড়ে যাবেন কিংবা মাথার মুকুট পরা রাজকন্যে হয়ে যাবেন। দেখা গেল বোতামটা দৃশ্যত কেউ টেপেনি, অথচ পিসিমা বদলে গেছেন টিয়াও নয়, রাজকন্যেও নয়, একেবারে সেই সিন্ডারেল্লার পরিতে, যে নাকি যাদুকাঠি ছুঁইয়ে লাউ-কুমড়োকে ঘোড়ার গাড়ি আর টিকটিকিকে সহিস বানিয়ে ফেলতে পারে।

পিসিমার সমস্ত প্রতিভা আর ভালবাসা ছিল রান্নাতে। শুধু শুচিবাইয়ের জন্যে নয়, তিনি ভাইঝিদের রান্নাঘরে ঢুকতে দিতেন না ভয়েও, পাছে তারা রান্না ভাল করে শিখে ফেলে উনুনের পাশে তাঁর নির্দিষ্ট জায়গাটুকু দখল করে নেয়। আর কিছুই তো নেই। ওই রান্নটুকু। সেবা-শুশ্রূষার কিছুই জানতেন না পিসিমা। তারজন্য সে সময় থাকতেন, আর নির্দেশ দিতেন। আসল কাজগুলো করত টমদিদি আর পুটপুটদিদি। পিসিমার এই আত্মত্যাগ আসলে অতি দুরূহ, তিনি নিজে ছাড়া আর কেউই বুঝবে না ঠিক কতটা। পিসিমা আসলে তাঁর নিজের ধরণে বিদ্রোহ করেছিলেন। বিদ্রোহটা ছিল দুগগি আর তার বড় ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে। দেবহূতি যে আস্তে আস্তে সহ্য করতে করতে শেষ হয়ে যাবেন, এটাই যে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাওয়ার পর থেকে, তারা স্বামীর পরামর্শদাদা ও বন্ধুর জায়গা নেওয়ার পর থেকে তাঁর ভূমিকা, তাঁর দ্বারা এর চেয়ে বেশি কিছু হয়ে উঠবে না এটা বুঝে গিয়ে দেবুর হয়ে বিদ্রোহটা মনোই করলেন।

কেউ অবশ্য ভেবেচিন্তে এসব করে না, এগুলো আসে চরিত্রের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে। ভেবে দেখতে গেলে মনোর এই প্রথম বিদ্রোহ নয়। জীবনে বারবার তাঁর এই বিদ্রোহী রূপ তিনি দেখিয়েছিলেন। বাবার পুনর্বিবাহে বিদ্রোহ করেছিলেন, তাঁর জীবৎকালে কোনওদিন সৎমাকে মায়ের স্বীকৃতি দ্যাননি। তাঁর বিদ্রোহ ছিল সবরকম অনাচারের বিরুদ্ধে, তা পঞ্জিকার নির্দেশ না মানাই হোক আর দুশ্চরিত্র লোককে বাড়ি থেকে তাড়ানোর ব্যাপারেই হোক। যতক্ষণ না সমস্যার রূপটা বুঝতে পারছে ন ঠিক আছে, তিনি তাঁর হাতা-খন্তি-হাঁড়ি-কড়া, ঝাল-ঝোল-অম্বলের জগতে একেবারে লুপ্ত, আত্মবিস্মৃত হয়ে আছেন, কিন্তু বোঝবার পর তাঁর চরিত্রগত তেজ ও উপস্থিতবুদ্ধি ঠিক আসরে নেমে পড়ে। তিনিও তো দুর্গাপ্রসাদেরই বোন, তারচেয়েও বড় কথা, শিবপ্রসাদেরই মেয়ে। আমার সামনের বাড়িতে থাকে মনীষা মজুমদার, একটি ভারি শান্ত, ভাবুক ধরনের মেয়ে। ভোর পাঁচটার সময়ে দেখি সে কফি নিয়ে বসেছে তার ঝুল বারান্দায়।



বেশ চওড়া বারান্দাটা। প্রচুর গাছ। রবার, কয়েক রকমের ফার্ন, ঘোর বেগনি রঙের পাতাবাহার। এতরকম পুষ্পহীন ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে উঁকি মারছে তারার মতো এক একটা রঙ ফুটফুট ফুল, আলতা রঙের, জরদা রঙের, ছোট্ট ছোট্ট খুকুমণি ফুল। মনীষার পরণে এখন হ্যান্ডলুমের লম্বা আচকানের মতো রাত-জামা, গায়ে শ্যামলিমা, তার মাথার চুলে নীলচে সবুজ শষ্প জড়িয়ে আছে। চোখে গভীর ঘুমঘোর। এখানে ঘুমিয়ে সে কি অন্যত্র জেগে উঠছে? বোধহয় তাই। কেন না সে কেমন আনমনে হিমজল মুছে দিচ্ছে রবার গাছের শাঁসালো চওড়া পাতা থেকে, কফিতে চুমুক দিচ্ছে, চোখ কোন সুদূরে। কফি শেষ করে মনীষা লেখার টেবিল গিয়ে বসল। আমি দেখতে পাচ্ছি, কমপিউটার খুলল, এবারে মনশ্চক্ষে দেখছি অক্ষর বসে যাচ্ছে অক্ষরের গায়ে গায়ে। ও বাড়িতে একটি ভদ্রলোকও থাকেন।



তিনি এতক্ষণে ঘুম থেকে উঠলেন, চেহারাটি বেশ, একেবারে সাধা গলার মতো, মাথার চুলে কিছু রুপোলি ঝিকিমিকি। মানিয়েছে ভাল। কিন্তু মুখটি সে তুলনায় ছেলেমানুষ। ভদ্রলোক হয় মনীষার সমবয়সী, কিংবা সামান্য বড় বা ছোট। নাম নীলাব্জ মুকতার। অপাঙ্গে ইনি মনীষার ধ্যানমগ্ন চেহারার দিকে চান, পেছন থেকে গিয়ে একটু দ্যাখেন তারপর মনীষার মাথার ওপর আলতো করে হাত রাখেন, নীচু হয়ে তার গালে গাল ঠেকান, একটা চুমুও আলতো করে রাখেন। কমপিউটারে চোখ, কি-বোর্ড থেকে আঙুল তুলে মনীষা ডান হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে মুকতারের গলা, একটু আনমনা হাসি তার মুখে, মুকতার রান্নাঘরে গিয়ে কফি করে নেয় এবং ওই একই বারান্দায় বসে কফি শেষ করে আস্তে আস্তে, মুখে খুব একটা শান্তির হাসি। এবার সে ঢুকে যাবে নিজের স্টুডিও ঘরে, তাদের সেক্রেটারি ছেলেটি আসবে, আসবে ঘরের কাজকর্মের ঝুমকিও। পুরো দৃশ্যটা হয় তো কল্পনা করলাম কিন্তু তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই।

ফোন এসেছে, ধরল সেক্রেটারি আজিজ, ফোনটি জনৈক ঋষি মজুমদারের। উনি জানতে চাইছেন মনীষা কেমন আছে, তার কাজটা কত দূর এগোল, মনীষাকে বিরক্ত না করে খবরটা যেন তাঁকে দেওয়া হয়। এই ঋষি মজুমদার কে? হাতে পারেন মনীষার অধ্যাপক, দৈবাৎ পদবিটা এক। মনীষা কোনও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করছেন তাঁর কাছে। হতে পারে ইনি মনীষার বাবা, তার পড়াশোনা কাজকর্ম সম্পর্কে খুব মনোযোগী, নিয়মিত খোঁজখবর রাখেন। আরেকটা সম্ভাবনা হল ইনি মনীষার স্বামী। শুনেছি এটাই ঠিক। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, দু'জনের কাজ কর্ম জীবনযাত্রার ধরনে কোনও মিল নেই। কিন্তু ঋষির দিক থেকে বন্ধন এখনও একইরকম। ঋষি মনীষার থেকে অনেক বড়,

কোনও বড় মাল্টিন্যাশনালের টপ লোক। তাঁকে সবসময়ে কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাঁর ঠিক যাকে বলে সংসার করা, স্ত্রী-সন্তানের দেখ-ভাল করা এসবের সময় নেই, এমনকী যখন ছেলে দুরারোগ্য অসুখে মারা গেল তখনও ইনি আসতে বা কোনও সাহায্য করতে পারেননি। সেই থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে এঁর মানসিক বিচ্ছেদ। মনীষা লেখালেখি করত, সেই সূত্রেই মুকতারের সঙ্গে জানাশোনা। সে চিত্রকর। এই তো বেশ, দু'জনে দু'জনকে ভালবাসে, যে যার কাজ নিয়ে আছে। এখন দু'জনেই সৃষ্টিশক্তির উচ্চতম শিখরে, একটা ঘোরের মধ্যে জীবন কেটে যাচ্ছে। সন্তান তার ভাগ্যে নেই বুঝে অভিমানে মনীষা তার লেখনীসম্ভব সন্তানদের নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেবে ঠিক করেছে। ভবিষ্যতে তার ভাবনা বদলাবে কিনা, ভবিষ্যতই জানে।

আমার মনে হয় এই সময়ে জন্মালে মনোমোহিনী মনীষা হতেন, তাঁর জীবনও এইরকম কিছু হত। একশো বছর পেরিয়েও মনোমোহিনীদের একাকিত্ব বোধহয় পুরোপুরি ঘোচে না, সংসারী জীবনযাপন করতে কোথাও না কোথাও একটা বাধার সৃষ্টি হয়, তবে নিজের পছন্দমতো কাজ করার ক্ষেত্র তাঁরা পান, যে স্বামীর সঙ্গে কোনও মিল নেই তাঁর বদলে সমরুচির বন্ধুর সঙ্গে থাকার সুযোগ ও ইচ্ছে হয়। নানা জটিলতা এ জীবনেও থাকতেই পারে, সেসবের মধ্যে আমরা নাই গেলাম। কিন্তু মনোমোহিনীর জীবনের কেন্দ্রীয় প্যাশন সাহিত্য এ যুগে জন্মালে নিশ্চয় তাঁকে আশ্রয় করত। ঢ্যাঙা, ময়লা, তার ওপরে বেথুনে পড়া, পাশ করা মেয়ে বলে তৃতীয় পক্ষের পত্নী হওয়া ছাড়া অন্য গতি নেই এমন বিচার এ যুগে নিশ্চয় বদলে যেত।

পিসিমাকেও আমি বেশ সক্রিয় ভূমিকায় দেখতে পাই। এ যুগে আর বালবিধবা হওয়ার চান্স থাকত না। সে জায়গায় হয় তো ডিভোর্সি। মনোরমা ধরুন এখন মৌ, সংগীত রিসার্চ অ্যাকাডেমিতে দীর্ঘদিন ধরে গান কি বাজনা শিখেছে, সংগীত নিয়েই এম এ পাশ করেছে। ব্যস্ত জীবন। বেশ বলিয়ে কইয়ে, প্রাণচঞ্চল মেয়ে মৌ। দ্বিতীয় বিয়ের জন্যে বাবা খোঁজ খবর করছেন, সে প্রেম ট্রেম করতে পারেনি। তার ক্ষুরধার মুখ ও বুদ্ধির কাছে দাঁড়াবে কে? ইন্টারনেটের মাধ্যমে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ। দু'জনের কথাবার্তার কিছু অংশ তোলা যাক। ভদ্রলোকের নাম ধরুন ময়ূখ। ইনি মৌয়ের থেকে বছর বারোর বড়। বিপত্নীক, নিঃসন্তান, স্বাস্থ্যবান, ভাল চাকরি করেন। সব দিক দেখে শুনেই মৌ ও তার বাবা এঁকে বাজিয়ে দেখছেন। এঁরা বসেছেন ধরুন বাইপাসের দিকে কোনও ঘ্যাম রেস্তোরাঁয়।

ময়ূখ—আপনার কেসটা স্যাড, তবে আমার মনে হয় আপনার স্বামী ভদ্রলোকটির তত দোষ নেই। যখন কিছুতেই বিয়ে করতে চাইছেন না, তখন নিশ্চয় তার কারণ আছে। আত্মীয়রা এ কাজগুলো ঠিক করে না, এই একুশ শতকেও কেন যে এমন হবে আমি ভাবতে পারি না। তবে মৌ যতই যাই বলুন আমার কেসটা আরও আরও স্যাড।

মৌ—সে তো বটেই। অকালমৃত্যু খুবই স্যাড। আপনার স্ত্রীর কত সুন্দর একটা জীবন ছিল। সেই জীবন ফেলে চলে যাওয়া, সত্যি খুব খারাপ লাগছে শুনে।

ময়ূখ—(দীর্ঘশ্বাস ফেলে) একটা মানুষ শেষ মানে দু'টো জীবন শেষ।

—সে কী? একেবারে শেষ? তা হলে এরই মধ্যে আবার বিয়ে করতে চাইছেন কেন? কিছু দিন অন্তত যেতে দিন। খুব যদি একা লাগে তা হলে ক্লাবে ট্রাবে গেলে পারেন। মৌ ছোট্ট একটু হাসি লুকিয়ে ফেলল।

—না না, এভাবে বললে পুরো ব্যাপারটাকে হালকা করা হয় মৌ। আমাকে বিয়ে-পাগলা বানিয়ে দেওয়াটা ঠিক না, এমন তো নয় যে বউ মারা যেতেই আমি আরেকজনের প্রেমে পড়ে গেছি। দেখুন আপনিও একা আমিও একা, দু'টো একাকিত্ব মিললে একটা নিটোল বন্ধুত্বও তো হতে পারে।

মৌ—তা হলে বন্ধুই খুঁজুন, বিয়ে করার দরকার কী? ময়ূখ আপনি ভুলে যাচ্ছেন আপনার বয়স বিয়াল্লিশ, এবং আপনি চোদ্দো বছর কনজুগাল লাইফ কাটিয়েছেন। কিন্তু আমি এখনও তিরিশ টাচ করিনি, আমার পেছনে কোনও বিবাহিত জীবন নেই, বরং আটটা বছর আমি একমনে নিজেকে দাঁড় করার চেষ্টায় কাটিয়েছি, প্রথম থেকেই আপনি প্রেম ট্রেম বয়কট করে আমাকে আসরে নামাতে চাইছেন? খুব ড্র্যাব ব্যাপারটা, যাই বলুন, মোস্ট আনইনভাইটিং।

—না না না না। আমি বলতে চাইছি একটা অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ মানেই কিন্তু গোড়ার দিকে সেটা একটা ম্যারেজ অব কনভিনিয়েন্স থাকে, তাই নয় কী? পরে তো প্রেম আসবেই, মানে এসে গেছে, মানে গেলেই হল।

মৌ—(হাসি চেপে) তাই? ম্যারেজ অব কনভিনিয়েন্স? কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমরা কে কী চাই আগে থেকে ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। আমার ক্ষেত্রে প্রেমটা অত এসেনশিয়াল না-ও হতে পারে, কিন্তু স্পেস পাওয়া চাই-ই। তাছাড়া এটা আমার একরকম প্রথম বিবাহই, আমি সেই মতোই ব্যবহার আশা করব, প্রতি মুহূর্তে যদি মনে করতে হয়, আমি একজনের জায়গা নিয়েছি, তার সঙ্গে তুলনাও টানা হয় মনে মনে তা হলে কিন্তু সেটা আমার ওপর অন্যায় করা হবে।

ময়ূখ—না না, সে আবার কী! এ সব প্রশ্নই উঠছে না, আমি নেহার কোনও ফটোও রাখব না, কথা দিচ্ছি। ধরুন অফিস থেকে ফিরলাম আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন, একা বাড়িতে ফিরতে হচ্ছে না, এটাই তো মস্ত ব্যাপার। তারপরে ধরুন দু'জনে মিলে ডিনার। সে যে কী শান্তির, মিসেসের নিজের হাতের রান্না, তার কি আর...

মৌ—দাঁড়ান দাঁড়ান, কী বললেন ময়ূখ? আমি রাঁধবো? আপনি কি আমাকে ডিনার রান্নার জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন না কি? জেনে রাখুন আই হেট টু কুক, এইসব আভেন বাসনপত্র, মশলাটিশলা এসব দেখলেই আমার ডিপ্রেশন হয়। কে জানে কোনও জন্মে হয় তো খুব রান্নাফান্না করতে হয়েছিল। তাছাড়া সবদিন ফিরে যে আমাকে পাবেনই তারও কোনও মানে নেই, কত প্রোগ্রাম থাকে আমার, তার রিহার্সালে সময় যায়, কত সময়ে শুনতেও যাই। আর ফটো রাখা নিয়ে আমার কোনও কমপ্লেক্স নেই, তা হলে বিপত্নীক বিয়ে করতে চাইব কেন? আসলে ফ্রেশার নিতে আমার আর সাহস হচ্ছে না। ফ্ল্যাট কেনার সময়েও আমি প্রোমোটারের হাত থেকে নতুন ফ্ল্যাট নিতে চাইনি, কে জানে কোথাও কী গন্ডগোল হয়ে আছে। কিন্তু হিংসুটে টাইপ আমি একেবারেই নই। অল আই ওয়ান্ট ইজ আ ফেয়ার ডিল। সরি ময়ূখ আপনার চাহিদা আমার সঙ্গে মিলছে না, আর কথা বলে লাভ নেই।

মৌ তড়াক করে উঠে পড়ে।

আমার মনে হয় আবার একটা জীবন পেলে মনোরমা একবার ঠকলেও দ্বিতীয়বার আর ঠকতেন না। ভাগ্য নামক চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেতেন না। ইশশ, ঠাকুরদা কত করে যে মনোকে গান শেখাতে চেয়েছিলেন! কত ভাল শিক্ষক রাখলেন! মনো তো কলঘরে দিব্যি কেত্তন গাইতেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং রাধিকা গোস্বামীর শিষ্য, চাই কি গান শিখতে শিখতে ষোল বছরের সদ্যযৌবনা নিমসুন্দরীর হৃদয়ে প্রেম জাগলেও জাগতে পারত, তার অবলম্বন যদি সেই সংগীত শিক্ষক হন, তাতেও আমাদের কোনও আপত্তি নেই, আমরা শুধু মনোরমার জন্যে একটা স্বাভাবিক জীবন চাই।

কিন্তু একুশ শতকে দেবহূতির কোনও রোল খুঁজতে আমার ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি শান্ত, সহ্যশীল। সহনশীলতা ঠিক আছে, কিন্তু শান্ত? এক সময়ে মেয়ে ঠান্ডা কি না এটা একটা রীতিমতো জিজ্ঞাস্য ছিল। এ যুগে কিন্তু চঞ্চলাদের কদর বেশি।

সুন্দরী কিন্তু তিনি সেক্সি টাইপ নন। আড়াই বছরের মেয়েকে ফ্রক কিনে দেওয়ার সময়ে আজকাল সেটা যথেষ্ট সেক্সি কি না দেখা হয়, ম্যাডোনা নিয়ে আমরা কী করব? লোভী নন, অথচ প্র্যাকটিকাল? নির্লোভ হলে কি ভুবনবাজারে নেমে পড়া যায়? প্র্যাকটিকাল হলে ঝাঁকের কই হয়ে ঝাঁকের সঙ্গে সাঁতরাতে হবে। স্বাধীনচেতা অথচ লয়াল! এটারই বা মানে কী? স্বাধীনচেতা হলে সে তো আপোস করবে না, বস বা বরের সঙ্গে মতের মিল না হলে আনুগত্যের কথাই বা ওঠে কী করে? এই বৈশিষ্ট্যগুলো একত্রে যায় না। দেবহূতিকে এই সময়ে ঠিক কোন জায়গায় ফিট করাবো, বলুন তো?

কোনও রাজনৈতিক নেতার স্ত্রী করে দিয়ে দেখা যাক তো দেবহূতি কী করেন! ধরুন ওঁর বর্তমান নাম দীপিকা। ফর্মাল শিক্ষার অভাবের জন্যে তাঁর সিদ্ধান্তগ্রহণের অধিকার একদা সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল তাঁকে এবার হাইলি এডুকেটেড, ইতিহাসের ডক্টর করে দেওয়া যাক। বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতি অর্থনীতিতে যা যা হচ্ছে সবই তিনি খেয়াল রাখেন। ধরুন শিল্পায়ন নিয়ে অবস্থা খুব ঘোরালো, দীপিকার স্বামী নাকানি চোবানি খাচ্ছেন।

—অত ভাবছ কেন?—দীপিকা শান্ত গলায় বললেন।

—বলো কী, ভাবব না? ভারতের সবগুলো স্টেট এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা কোথায় পড়ে আছি! সমালোচনায় কান পাতা যাচ্ছে না।

—যে সব স্টেট ইন্ডাস্ট্রিতে এগিয়ে গেছে সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কী? খেয়াল করেছ? কৃষকরা তো আত্মহত্যা করছে, দাঙ্গা লাগছে।

—মানে?

—সাধারণ মানুষই তো নব্বুই পারসেন্ট, তাদের পালনটাই তো আসল কাজ! ইন্ডাস্ট্রি তো তাদের রক্ষা করতে পারছে না। আত্মহত্যাও একরকম হনন, দাঙ্গাও তা-ই জেনো, মানুষের চেতনায় থ্যানাটসের প্রভাব, লাইফ ফোর্সের জায়গায় ডেথ। যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখনই মানুষ মারে আর মরে।

—ফ্রয়েডে চলে যাচ্ছ কেন? এখন কী আমার শাস্ত্র শোনার সময় আছে?

—সময় করে নিতে হবে। কোথায় কী ঘটেছে, কোন ঘটনার কী অর্থ, ইতিহাসের শিক্ষা কী, এগুলো না জানলে কী করে ঠিক কাজটা করবে?

—তোমার মতে ঠিক কাজটা কী?

—পাশের বাড়ির ছেলে আইটিতে গিয়ে লাখ লাখ টাকা আয় করছে দেখে তুমি যদি তোমার চমৎকার ছবি-আঁকা ছেলেটিকে জোরজার করে কমপিউটারে ঢুকিয়ে দাও, ছেলেটার ছবিও যাবে, লাখ টাকা আয়ও হবে না। মানো তো?

—না মানি না দীপিকা। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন যাঁরা ইচ্ছের বিরুদ্ধে জীবিকা নিয়েও দারুণ সফল হয়েছেন।

—মনের আনন্দ, শান্তি এগুলো তাঁরা পান কি? সব সময়ে একটা আক্ষেপ ভেতরে ভেতরে কাজ করে যায়। এনিওয়ে, তাঁরা এক্সেপশনাল। কিন্তু যার যেটা স্ট্রং পয়েন্ট সেই অনুযায়ী এগোলে যে অল্প চেষ্টায় বেশি ভাল ফল লাভ হয়, শান্তিটাও বজায় থাকে এটা তো মানো? জীবনটা তো খুব বড় নয়, হিসেবি হতে দোষ কী!

—মানা গেল, তবে আমাদের সমস্যার সঙ্গে এ সব কথার সম্পর্ক কী বুঝলাম না।

—পশ্চিমবাংলার প্রাকৃতিক সামর্থ্য যদি তার উর্বর জমি হয়, তা হলে সেটাকেই ফোকাসে রাখলে হয় না?

—হঠাৎ? তুমি যে একেবারে গান্ধীয়ান হয়ে গেলে? রাজনৈতিক স্বামী হেসে ফেললেন।

—গান্ধীয়ান, নেহরুভিয়ান, মাওইস্ট, মার্কসিস্ট এই খাঁচাগুলো থেকে কিছুতেই বার হতে পারো না, না? ভেবে দ্যাখো, মানুষের জন্য তত্ত্ব তৈরি হয়, তত্ত্বের ছাঁচে মানুষকে ফেললে বাস্তবকে অস্বীকার করা আর পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই হয় না।

—তা তুমি কি বলতে চাও এখন আবার চাষ আবাদে ফিরে যাবো? গরুর গাড়ি?

—তুমি খুব ভালই জানো আমি তা বলছি না, ইন্ডাস্ট্রি যা আছে রাখো, আর যা হওয়া সম্ভব তা নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু যা হওয়ার নয়, জোর করে তা দেশের ওপর চাপিয়ে দিলে খুচরো দু'চারজনের লক্ষ্মী লাভ হলেও পাঁচজনের সমূহ বিপদ। খাদ্যের চাহিদা কোনওদিন কমবে না, তার কোনও বিকল্পও দেখতে পাচ্ছি না। যন্ত্র তৈরি না করে যদি আমরা খাদ্য উৎপাদন, তার প্রক্রিয়াকরণ, তার চলাচলের জন্যে রাস্তাঘাট আর বাজার তৈরি করি, এবং আরও অ্যালায়েড অ্যাগ্রোইন্ডাস্ট্রির ওপর জোর দিই আমি তো অন্তত লাভ ছাড়া কোনও ক্ষতি দেখতে পাচ্ছি না।

—খুচরো ল্যান্ড একত্র করতে না পারলে উন্নত এগ্রিকালচার হবে না, তুমিও জানো আমিও জানি। আর সেখানে এ দেশে কী পরিমাণ বাধা তোমার ধারণাই নেই।

—কেন ধারণা থাকবে না? জোর যদি করতেই হয় সেখানেই করো, বোঝাও, জমি কাড়ার জন্যে কোমর বেঁধে লেগো না। জমি একত্র করো, উন্নত চাষ করো, বিশেষজ্ঞ দিয়ে চাষবাসের জন্যে চার্ট তৈরি করো। তোমরা কি মনে করো লোকে কিছু বোঝে না? সবই বোঝে। নিজের আঁতে ঘা না লাগলে প্রতিবাদ করা এ দেশের লোকের ধাতে নেই তাই বেঁচে গেছ।

—আমি একা কেন সবাই আমরা এইভাবেই ভাবি। বড় বড় নেতা, ইতিহাস তাঁদের কিছু কম পড়া নেই। ইতিহাস অনেকে ঘটতে দেখেছেন। এক্সপিডিয়েন্ট হতে হয়, বুঝলে? প্রতিটা ইলেকশনে ইন্ডাস্ট্রি কীভাবে টাকা ঢালে, জানো?

—জানি। তা হলে সেটাই বলো, ক্যাপিটালের কেনা হয়ে দালালি করছ আর মুখে আমজনতার চাকরি আর উন্নয়নের কথা বলছ? এই দুষ্টচক্র ভাঙো। ক্যাপিটালিস্টদের টাকায় কেনা গদিতে বসে তাদের স্বার্থ দেখাকে কী গণতন্ত্র বলে? ছিঃ।

এই সময়ে নেতার আপ্তসহায়ক তাঁকে একটা জরুরি ফোনকল নিতে বললেন। শুনতে শুনতে নেতার মুখ একবার লাল একবার কালো হতে থাকল।

কথা শেষ করে একবার কটমট করে তাকালেন নেতা স্ত্রীর দিকে। বললেন—হিস্টরি কনফারেন্সে কী বলে এসেছো 'ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন, আ নিউ ফর্ম অব ইম্পিরিয়ালিজম' না কি ছাতার মাথা? বিগ থ্রির কানে পৌঁছে গেছে। বলছিল ঘরের লোক যদি শত্রুতা করে তা হলে কী করে আমরা বাঁচি মিঃ মাজি? মানেটা বুঝতে পারলে? কার বাঁচার কথা বলছে বোঝার ক্ষমতা তোমার আছে?

দীপিকা বললেন—আমি রেবেল নই, ইতিহাস পড়ি। সেই ইতিহাসে তোমাদের ভূমিকা, তোমার বিগ থ্রির ভূমিকার রেকর্ড থাকবে, আমি হয় তো নিশ্চিহ্ন যাবো। কিন্তু সত্যি কথাটা তোমাকে অন্তত বলে যাই।

—তাই যাও, আমাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে, বর্তমানের চাহিদা বুঝে না চলতে পারলে নিশ্চিহ্ন হওয়া ছাড়া আর কোনও গতি তোমাদের নেই।

দীপিকার মনে হল অনেক দিন আগে কোথায়, কখন যেন এইরকম, ঠিক এইরকমটা ঘটেছিল, কেমন একটা চেনা চেনা গন্ধ বেরোচ্ছে যেন সমস্ত ঘটনাটা থেকে।

দুর্গাপ্রসাদ বলিলেন—ইঁহারা লোকগুরু, ঈশ্বরের দূত, আমাদের মতো সামান্য জনের পারলৌকিক উন্নতির ভার লইয়া থাকেন। তুমি সংসার বুঝো, মোক্ষ বুঝো না, তোমার দোষ নাই, তুমি তো এ সকল ভাবনার জন্য প্রস্তুত হও নাই। কিন্তু তোমার আমার পুত্র কন্যারা এত শিখিয়াছে, বলিতে কি প্রত্যেকটি রত্নবিশেষ। উহারা শুদ্ধ এ মহিমা উপলব্ধি করিয়াছে। তুমি আর সংসার সংসার করিয়া আমাকে বাধা দিও না।

(ক্রমশ)

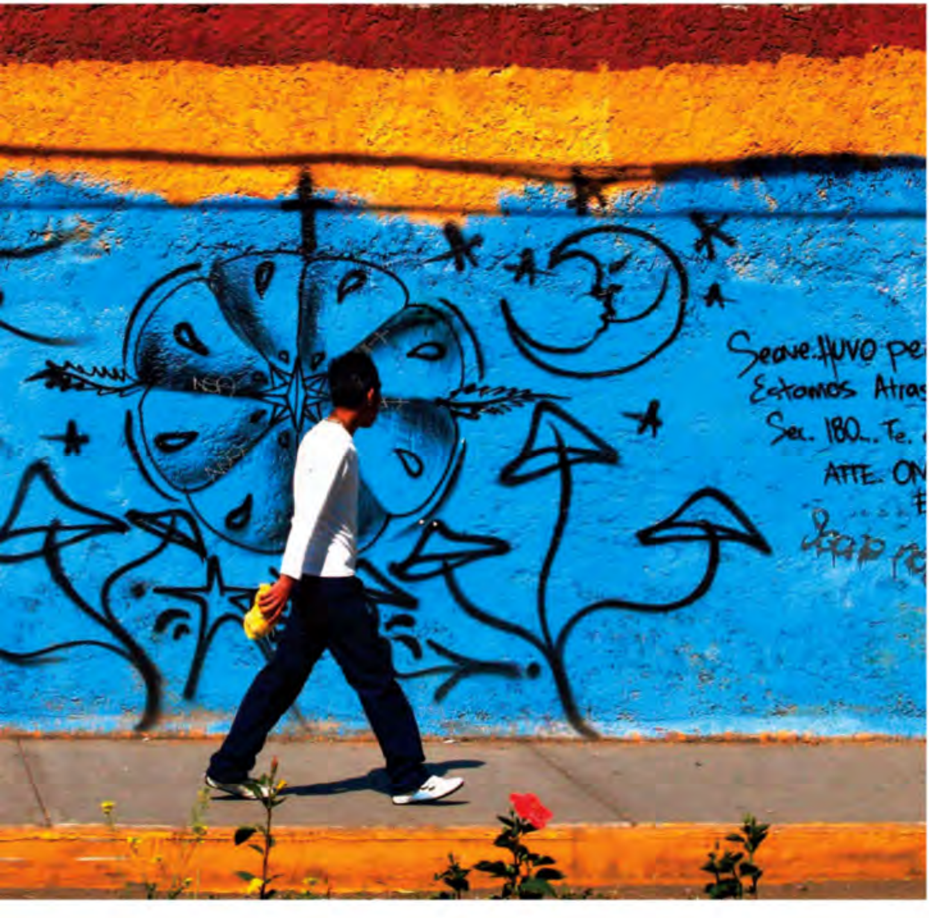
ছবি : ঈলীনা বণিক

র‍্যান্ডম, যায়িচ্ছে, ভাবনা লোফালুফি

আসুন, হাঁটা শুরু করা যাক। এই যে স্তূপাকার ইট দেখছেন, আরে এদিকে তাকান, বাঁদিকে, হ্যাঁ, এ কাল অবধি ছিল একটা সিমেন্টের ভ্যাট। এখন ভেঙে গুঁড়িয়ে কাঁচামাল হচ্ছে, পাশের পুকুরের পাড় বাঁধিয়ে দিতে কাজে লাগবে। দিনভর অসম্ভব দমাদ্দম হাতুড়ি খেয়ে সে যখন সিমেন্টত্ব হারাচ্ছিল, পাশের বাড়ির বারান্দা থেকে ঝুঁকে একটা বাচ্চা গোল্লাচোখে ক'ঘণ্টা তা দেখার পর ছোটকাকাকে গিয়ে জিগ্যেস করে ন্যাকার-বোকার প্রশ্ন, আচ্ছা, ওর লাগছে না? সে নাকি হিস্ট্রি বইতে কোন বিরাট ধর্মপ্রচারকের বাণী পড়েছে: জড়বস্তুরও প্রাণ আছে। হাঃ। প্রাণ আছে তো ব্যাটা জড় কেন? আর, এ নিয়ে ছ'মুহূর্ত ভাবতে বসলে তো প্লাস্টিকের প্যাকেটটার টুঁটি মুচড়ে ফেলে দেওয়া যাবে না। রোলের কাগজকে না-ছিঁড়ে ধীরে নামিয়ে দিতে হবে লজ্জাবতীর মতো। আর গামছা নিংড়োনো তো গামছার প্রতি হিটলারোচিত আচরণ! আরে অত কথা কী, জগদীশ বোস বলে গেলেন গাছের প্রাণ আছে, তা-ই কি আমরা মানি? না, মানতে পারা সম্ভব? শ্রাদ্ধে-বিয়েতে গাছের আঙুল কেটে বোঁটা কেটে চোখ খুবলে গলাটা ইস্ক্রুপের মতো পাকিয়ে দুমড়ে নিয়ে না-এলে অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য থাকবে? প্রেমিকার সঙ্গে যখন মাঠে গিয়ে বসি, তার অতুলনীয় তানপুরো-নিতম্বের তলায় এক্ষুনি যে কয়েকশো ঘাস ও মাগো ওগো অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি গো বলে চাপা পড়ে শ্বাস আটকে দাপাতে দাপাতে মরে গেল, সে হিসেব রাখতে গেলে আমরা জীবন বাঁচব কী করে? যাগ্গে পুকুরটা দেখতেশুনতে ভাল হবে, পাড় ধবধবে হয়ে গেলে সকালের হাঁটাটাও লাগু হবে। কেউ কেউ হেভি আপত্তি করেছিলেন, পুকুরের ধার বাঁধালে নাকি মাটিতে থাকা কীসব গেঁড়ি-গুগলি মরে যায়, চারপাশের কী সব কাদাখোঁচা টাইপ পাখপাখালি আছে, তারা ওইসব খেয়েই বাঁচে, তারাও সদলে খিদের চোটে অক্কা পায়, তাই না-বাঁধানো মাটির পাড়-ই দারুণ ছিল। বোঝো। মনে পড়ে গেল, বছরখানেক আগে কোন একটা গ্রামে উন্নতি করার জন্য রাস্তায় রাস্তায় আলো লাগানো হয়েছে। দেখা গেল, গহন রাত্তিরে ওই ফ্যাটফ্যাটে উজ্জ্বল আলো জ্বলার জন্য কীসব পোকা ধানের দুধ খেতে ঝাঁকে ঝাঁকে নামতে পারছে না। তারা নিবিড় আঁধারে ওই কাজ করে আসছে হাজার বছর। চরাচর যখন ঘুমোয়, রাতের কালো চাদরের তলায় দলে দলে চুপে তারা ধানের বুক থেকে আদরটাদর করে পোষ্টাই টেনে নেয়, ধানও ফুল্ল হৃষ্ট পল্লবিত হয়ে ওঠে, চাষির সাংঘাতিক ভাল হয়। এবার? গাঁয়ে এত আন্দোলন করে ইলেকট্রিসিটি এল, বিপদভর্তি পথ তকতকে ল্যাম্পপোস্ট পেয়ে ভরসার শ্বাস নিল, এখন তুমি রাত বারোটার পর রাস্তার আলো নিভিয়ে ঘুটঘুটে করে দেবে? রাহাজানি আর গরগরে মার্ডার আর নিরীহ মেয়ের ধর্ষণ আটকানো বেশি জরুরি না কোথাকার জীববিজ্ঞান বইয়ের কোন চ্যাপ্টার ব্যাহত হচ্ছে আর বাস্তুতন্ত্র চিড় খাচ্ছে সে-কথা মাথায় ঢুকিয়ে পোকা নাড়ানো বেশি জরুরি? মশাই, ভাবতে গেলে ক্রমে ঘেমেনেয়ে যাবেন। এই ধরুন কালকে সারা রাত্তিরটা এই বস্তির লোকগুলো ভিডিও দেখল। গাঁকগাঁক করে জিৎ আর কোয়েল চেল্লাল, আর আমাদের ঘুম ফর্দাফাই হয়ে মশারির ধারটায় খাবি খেতে লাগল। অফ কোর্স আমাদের এত সাহস নেই যে জানলা খুলে 'এইও, ভেবেছ কী! ঘুমোতে দেবে না! দেব পুলিশে খবর?' হুমকি দিই। হয় না কি? ভদ্রলোক হয়ে বস্তির সঙ্গে মুখ লাগাতে যাওয়া? গরিবের অতুলনীয় তেজ। চারটে থান ইট ঝেড়ে দিলে পালাব কোথায়? বাপ তুলে খিস্তি শুরু করলে উত্তর দেব কী? লেটারবক্সে চকলেট বোম রেখে দিলে না-হক একশো টাকার ধাক্কা। এইসব অসভ্যতাকে আবার অতুলনীয় অন্তর্ঘাত হিসেবে দেখিয়ে আমাদের কাল্ট-লেখক চারটে এক্সট্রা গল্পও লিখে ফেলতে পারবেন। তাঁর মতে ধাঁ-চকচক অফিসের রিসেপশনের সোফায় গোল্লা সিকনি লাগিয়ে আসা নাকি বিপ্লবের গোড়ার শর্ত। সে যাক। এখন কথা হল, গরিবের ফুর্তির দরকার। তার প্রতি নিরন্তর সামাজিক শোষণ, তার বাড়ি বাড়ি ঝি-র কাজ করার সময় একটা দিনও ক্যাজুয়াল লিভের ব্যবস্থা না-থাকা, তাকে সব ভদ্দরলোকের তুমি-তুই অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন, তার আশাহীন ভবিষ্যৎ অপমানময় অতীত, হিসির ডাঁইয়ের পাশে ঘুমোতে বাধ্য হওয়া, এ-সব ভাবলে মনে হয়, একটু বেশিই ফুর্তির দরকার। কিন্তু যে মধ্যবিত্তের কালকে অফিসে করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে প্রেজেন্টেশন, যে সাংবাদিককে কালকে ভোরে উঠে ইন্টারভিউ নিতে ছুটতে হবে, অবশ্য না না, এ-সব কথার অনেক আগের সপাট যুক্তি: একটা লোকের পয়সা আছে বলে তো তার ঘুমের অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। পয়সা করে ফেলেছি বলে তুমি আমার



মাথায় ফুটবল খেলবে ভাঁজ মারবে সাবঅল্টার্ন টার্ন নেবে আর আমি পাশ ফিরে সরি স্যর সরি স্যর জপে যাব, তা কেন? তা হলে আপনি ব্যাপার কীভাবে প্রোজেক্ট করবেন, ইতিহাসগত ভাবে ল্যাং খেয়ে এসেছে বলে গরিব কি যবেতবে আপনার দাড়ি ওপড়াবে, সুবিধাভোগী শ্রেণি হিসেবে আপনি ফি-পাব্‌ন রাতের দিকটায় ঝাড় খাবেন? না কি, যা হয়েছে হয়েছে, অতসব জানতে চাই না, পয়সা নো পয়সা, মৌলিক অধিকারগুলো আমার হ্যাজ? হুঁ, ওদিকটায় টেরিয়ে তাকাচ্ছেন কেন? বুঝেছি, ওই বাড়ির তিনতলার ফ্ল্যাটে নতুন লোক আসার ব্যাপার তো? উরিব্বাস, কী বড়লোক কী বড়লোক! মানুষকে মানুষ মনে করে না, পারলে জাঙিয়া পরে শপিং মলে যায়। সক্কলেরই চোখ টাটাচ্ছিল, কানের দফারফা হল দোলের আগের রাতে। ব্যাটারা ঘরের মধ্যে দানবিক স্পিকার-রাশি জড়ো করে, সমাজবিরোধী ভল্যুমে তাবৎ হিন্দি গান বাজাতে শুরু করল। অজস্র বন্ধুবান্ধব কোত্থেকে ছুট্টে এসে নাচ জুড়ে দিল। ঝংকার বিট সারারাত থামল না। ওই গাম্বা-ডেসিবেলে বাড়ি যে ভেঙে পড়ল না, তাতে স্থপতির প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। সারা পাড়ার পরের দিন চোখ লাল। কিন্তু বাজারময় শত ক্ষুব্ধ গুজগুজ ফুসফুসে কী হবে? কারও কি তিনতলা উঠে গিয়ে বলার সাহস আছে? পাগল! বড়লোকের সঙ্গে কে লাগতে যাবে? টাকা দিয়ে ওরা সব পুলিশকে এগারোবার কিনে নিতে পারে। কলিং বেল টেপামাত্র পয়সার গরমে চাট্টি চকিত চড় আশ্চর্য কী? প্রত্যেকে ঠিক করল পরের বছর দোলের আগে শান্তিনিকেতন। তা হলে কে বেশি খারাপ, গরিবের গুন্ডামি না পয়সাওলার প্রতাপ? কোন জ্বলুনিটা হাই-ডোজ, বস্তিকে কিছু বলতে না-পারা না বিলিওনেয়ারকে দেখে কুঁকড়োনো? মশাই, ডিলেমার চোটে চ্যাপ্টা হয়ে যাবেন। না ন্না, ওই বারান্দা থেকে চোখ সরিয়ে নেবেন না, ওই কুকুরটাকে বরঞ্চ ভাল করে দেখুন। ওর পেছনের দু'টো পা একটা অটো চাপা দিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর থেকে হাঁটত পেছন ঘষটে ঘষটে। সেই অবিরত ঘষটা খেতে খেতে ওর পা তো বটেই, পেছন তো বটেই, এমনকী কয়েক জায়গায় ওইসবও, চিরে, ছড়ে, রক্ত খসে, পুঁজ গড়িয়ে, ইনফেকশন ছড়িয়ে, বীভৎস হয়ে ফুলে উঠল। একটা লাল টকটকে ঘা-ই যেন ও, শুধু কেউ শিল্প ফলিয়ে সেটাকে একটা কুকুরের আকৃতি দিতে চেয়েছে। বাবাগো, যেই তাকায়, শিউরে চোখ সরিয়ে নেয়। মরবে তো বটেই, দগ্ধে দগ্ধে মরবে। গা ঘিনঘিনও করে, আর পৃথিবীর নির্মমতা চট করে রদ্দা মেরে যায়।





খোঁজ নিয়ে জানলাম, পাড়ার একটা লক্কা টাইপ লোফার আছে, সে-ই শুধু ওকে দু'বেলা খেতে দেয়। বললাম, কর্পোরেশনে একটা খবর দে, নিয়ে যাক। সে বলে, কাকু, কর্পোরেশন নিয়ে গেলে কালকেই ওকে মেরে ফেলবে। ফের হ্যাপা। এই অবস্থায় ওকে ভাত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখাটা বেশি মানবিক না কর্পোরেশন নিয়ে গিয়ে ওর যন্ত্রণা ধাঁ করে ঘুচিয়ে দিলে তা বেশি মানবিক? মানে, কুকুরটার পক্ষে কোনটা ভাল? এমন অসহ্য বেদনা সয়ে বেঁচে থাকা ভাল? তবু যে ও চারপাশ দেখতে পাচ্ছে শ্বাস নিতে পারছে শুধু এইজন্যে আগুন লেগে যাওয়ার মতো কষ্ট প্রতিটি মুহূর্ত সহ্য করা ভাল? গল্পে তো আমরা পড়তাম প্রবল পা ভেঙে যাওয়া ঘোড়াকে গুলি করে তার যন্ত্রণার অন্ত ঘটানো হত, চোরাবালিতে ডুবতে থাকা হাতিকেও? ওই লোফারটার ভালবাসা তা হলে কুকুরের অস্তিত্বকে সঞ্জীবিত করছে না আসলে অসম্মানই করছে? সে কুকুরটার জীবনে কয়েকশো ইউনিট বাড়তি কষ্টের আমদানি করে নিজের ইগোকে মালিশ ঘটালে আমরা তাকে বাহবা দেব না গাল পাড়ব? একটা গোটা পাড়া আঙুলটি তুলে এগিয়ে আসেনি এবং সে স্বতঃই কুকুরের ভার গ্রহণ করেছে জেনেও? আরে, কী মিষ্টি দেখুন, রিকশা চড়ে বাচ্চাটা মায়ের সঙ্গে ইস্কুল চলে গেল। বাচ্চাটার বয়েস দু'বছর তিন মাস। তাতেই বলে ওর ইস্কুলে ভর্তি হতে দেরি হয়ে গিয়েছে। মানুষ নামক প্রাণী নাকি এখন বছরখানেক বয়স হতে না-হতে ইস্কুল চলে যায়। বোঝো। এদিকে মানুষ এমনিতে তো তৈরি হয়েছিল পড়াশোনা না-করার জন্যই। মানে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে যদি একটা যাপনের নির্ধারক উপাদান ধরি আর কী। ঈশ্বর তো চেয়েছিলেন আমরা মোটামুটি ধুলোয় খেলে-গড়িয়ে-নেচে-লেপটে বড় হই আর পাঁইপাঁই দৌড়ে হরিণ প্যাদাই। খুব প্রশংসনীয় আর সঙ্গত কারণে আমরা তাঁর ওপর অতুলনীয় খোদকারি করে নিজেদের শর্তে ধরণী ধামসাচ্ছি। শিক্ষাব্যবস্থা মানুষের তৈরি করা একটা জিনিস, আমরা ধরে নিয়েছি তা এতটাই জরুরি, আমাদের বিকাশের পক্ষে তা কম্পাল্‌সরি। কিন্তু কতটা জরুরি? ওষুধের মতো? টিকা-র মতো? যা প্রায় জন্মমুহূর্ত থেকে চালু হয়ে গেলেই চমৎকার? না কি, এই যে সামান্য ক'টা দিবসরাত্রি শিশু পাচ্ছে প্রায় পূর্ণ-স্বাধীন, প্রায় অনুশাসনহীন ও অ-সংগঠিত এবড়োখেবড়ো, একদম আকাশের তলায় (আসলে সিলিঙের তলায়, কিন্তু তা আকাশধর্মীই) ইচ্ছেমতো অ্যালাত্যাড়া বয়ে যাওয়ার খেয়াল-অধিকারসহ, আমাদের উচিত এটাকে যথাসম্ভব দীর্ঘায়িত করা? তাকে যতগুলো সম্ভব এমন সূর্য-ওঠা ও অস্ত-যাওয়া দেওয়া, যখন সে হতে পারছে পরিপূর্ণ, বাঁকা সে বা পাকা সে, ডিগবাজি খাওয়া সে বা পাশবালিশ আঁকড়ানো সে, যখন তার ওপর কোনও চাপিয়ে দেওয়া সংহতি বা প্রকোষ্ঠমাফিকতা তাদের খর কাজ করে যাচ্ছে না? আবার দেখুন, জন স্টুয়ার্ট মিল-এর ব্যাপারটা। তাজ্জব, অ্যাঁ? বাপ তাঁকে তিন বছর বয়স থেকে গ্রিক পড়িয়েছেন, আট বছর বয়সের মধ্যে যা-কিছু পড়ার, লাতিন-ফাতিন, দর্শন-টর্শন সব, সমস্ত, সমুদয় তাঁর পড়া শেষ। ভাইবোন ছাড়া কোনও সমবয়সিদের সঙ্গে মিশতে দেওয়া হত না, এমনকী ডিনার-টেবিলে বাবা ও বাবার বন্ধুদের সঙ্গে সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনায় বাধ্যতামূলক ভাবে যোগ দিতে হত, হ্যাঁ, পাঁচ বছরের ছেলেটাকেই। সোজা কথা, বাবার প্রোজেক্ট ছিল, ছেলেকে জিনিয়াস বানাবই। এবং, লো অ্যান্ড বিহোল্ড, ছেলে তা হয়েওছিল। আজও ছেলের দিকে তাকিয়ে জগতের বিস্ময়ের একূল ওকূল তিনকূল ভেসে যাচ্ছে। তার মানে, ব্রেনকে থাবড়েথুবড়ে বহুৎ আগে থেকে মশলাপাতি মেশালে সে নধর ও বহুপ্রাবী হয়ে উঠতেই পারে। সে-কাজে দেরি করা কি ঠিক? লাল ফেলতে ফেলতে আমার গোপাল কী লীলায়িত হামা টানবে আর পাঁচটা আধো লাম্পা হাম্পা বলবে, সেই অমৃত চাখতে আমি তার চটজলদি ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে পড়া-টা রুখে দেব? একটা দিন স্কুলে দেরি মানে কি আমি তার বিপুল সম্ভাবনাকে, অসীম হয়ে ওঠা-কে একদাগ করে পিছিয়ে দিচ্ছি?



মশাই, ব্রহ্মতালু রাজনীতির মতো গরম হয়ে উঠবে, তবু অনুশীলনী সতেরো-র সমাধান পাবেন না। অ-ই দেখুন, কোন ফাজিলরা ডিভাইডারের ওপর মূর্তিগুলোকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। দেখাচ্ছে যেন ফ্রিজ করে যাওয়া ট্রাফিক পুলিশ। হাতফাত তুলে আছে তো। এরা সব কী বলুন তো? মরা ঠাকুর। গাছের তলায়, পার্কের ধারে এদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে যায়। আর ধীরে ধীরে নাক, কান, কবচ, কুণ্ডল, মেখলা, বুক, সব আদুড় হয়ে, পচে, খসে পড়ে। দেবতাও মরণশীল, এই আশ্চর্য তথ্য সাড়ম্বরে প্রচারিত হয়। যাদের লোকে চূড়ান্ত ও অব্যয় ফাটাফাটি হিসেবে আরাধনা করেছে, তারা নিতান্ত অসহায়ের মতো পড়ে পড়ে রোদ-হাওয়ার মার খেতে থাকে ও অনুভূতিপ্রবণকে বোঝায়, কালের কাছে কারওরই রেহাই নেই। এমনকী আলগা প্যান্টালুন একহাতে তুলতে থাকা বালক এসে তাদের নাকে ছপটি মেরে যায়। মাথায় কাগ গু করে। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত দেব-দেবী আধশোয়া বা ফুলখাড়া হয়ে নিজ নিয়তির মধ্যে দিয়ে বিষণ্ণ ট্রেনের মতো যেতে থাকেন। এবার প্রশ্ন হল, এই মরা ঠাকুর চোখের সামনে দাঁইড়ে কি ভাল হচ্ছে? অন্তত একটা ক্ষেত্র এ মর-জগতের সামনে থাকা উচিত ছিল না কি, যা পুরোপুরি অকলুষ ও অক্ষয়? যার বেলায় পার্থিব নিয়মাবলি স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়ায়? যা এমন তুলনারহিত উদ্ধত সুন্দর, এত ঠিক, এত মালিন্যহীন, এত শুচি, চারপাশের আবর্জনার মধ্যে বেখাপ্পা উঁচু মিনারের মতো জেগে থাকে? একটা আইতেযাইতে স্যালুটযোগ্য দ্বীপ? এবং যা দেখে, অনুপ্রেরণা নয়, সে তো খুব বড় শব্দ, একটা আশ্বাস, একটা ঝিলিক, যে, শালা, বারোয়ারি হেরে যাওয়ার মধ্যেও পাইকারি মুখ-ঘষটানি সত্ত্বেও হোলসেল লাথ-খাওয়ার মানচিত্রেও অন্তত একটা কিছু আছে, রইল, যা পড়ে-থাকা পায়খানা ডিঙিয়ে বাঁচতে পারে? জীবনের অন্তত খানপাঁচেক সক্কাল নাগাদ যার দিকে তাকিয়ে মনে হবে, চলো ভাগ্যে, লাফ দিই, সমুদ্র না-পেরনোর কিচ্ছু হয়নি? না কি, উল্টো? ব্যবচ্ছেদ করে দেখিয়ে দেওয়া উচিত, কিস্যুই একমাত্রিক দুর্দান্ত নহে, সব পিতিমেরই কাঠের গোঁজা জাগরূক, যেমন বুদ্ধদেব অসামান্যা রূপবতী বেশ্যার মৃতদেহ নগরের কেন্দ্রে এনে রেখে দিয়েছিলেন, দাহ করতে দেননি : দ্যাখো বালকবালিকাগণ, এর তুলনাহীন মুখমণ্ডলের আড়ালে আছে অকথ্য করোটি, তুঙ্গ-সৌষ্ঠব ফিগারের ঠিক পিছনেই অপেক্ষা করছে কঙ্কাল, আরে ভাই শেষ অবধি নিটোল লোভনীয় স্তন ইজ ঝোলা মাংসগ্রন্থি, যাতে সাদা কুচি কুচি কৃমি ধরে ও কুরে খায়, নিতম্ব ঘৃণ্য মলভাণ্ড বই কিছু না। বুদ্ধদেব কি ঠিক করেছিলেন? শারীরিক ও মানসিক, উভয় হাইজিনেরই কি সহায়ক উক্ত সাহসী সিদ্ধান্ত? মরলে মানুষের কঙ্কাল বেরিয়ে যায় বলে জ্যান্ত এলিজাবেথ টেলর-এর ক্লিভেজের দিকে না-তাকিয়ে থাকার যুক্তি আছে? এবং পরম আনন্দময় ধকধকে যৌন উত্তেজনা উপভোগ না-করার? ডিভাইডারের ওপর মৃত ভগবানের বিজ্ঞাপন দর্শাবার দরকার কী ছিল? তার চেয়ে ভগবান থাকত রূপকথা-উচিত, ঝলমলে ও আলোসম্মোহন-অধ্যুষিত এক ফ্যান্টাসি-অঞ্চলে, যা আমাকে দিত সব-পেরনোর টনিক। যা আমাকে বলত, ছোটভাই হে, মোটেই সব বস্তু পোড়ে না অস্ত্রে কাটে না গলে যাওয়ার তো প্রশ্নই নেই, ম্যাজিক আলবাত সম্ভব, শুধু জীবন করো প্রার্থনার ন্যায় একাগ্র ও নাগাড়ে উত্তরণ-প্রয়াসী? ধুয়ে নাও করতল দফা দফা? ও কী ও, চললেন না কি? আমার সঙ্গে হাঁটতে আর ভাল্লাগছে না? মহা গেরো। এখন ভাবতে বসতে হবে, মনের কথা বলার সঙ্গী না-থাকা বেশি খারাপ? না কি, মনের কথা বোঝে না, এমন সঙ্গী থাকার চেয়ে খারাপ আর কিচ্ছুই নেই? লাও ঠেলা।

রোববারের মেগা

ক্ষমা করো হে প্রভু

রূপক সাহা

ইউনিভার্সিটির সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় বিপ্লবের সঙ্গে দেখা হয় গোরার। দু'জনে গিয়ে বসে রেস্তোরাঁয়। বিপ্লব গোরাকে অনুরোধ করে ইউনিভার্সিটির ডিবেট কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ না করতে। সম্মতি জানায় গোরা।

৮

দোকানের অবস্থা দেখে বুকটা ধক করে উঠল জয়দেবের। বইপত্তর আর অবশিষ্ট কিছু নেই। ঘরের চারধারের দেওয়াল পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। সাধ করে ও যে ম্যাজেনাইন ফ্লোরটা করেছিল, তার চিহ্নমাত্র নেই। সিলিংটা হঠাৎ অনেক ওপরে উঠে গিয়েছে। মেঝেতে পোড়া বইয়ের স্তূপ থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। দমকলের লোকদের দেওয়া জল জমে রয়েছে এক কোণে। পুরো ঘরটায় পোড়া পোড়া গন্ধ। নজর বুলিয়েই জয়দেব ঘর থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এল। ক্যাশ বাক্সে কাল হাজার পাঁচেক টাকা ও রেখে গিয়েছিল। প্রেসকে সেই টাকা দেওয়ার কথা ছিল আজ। বোধহয় সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

রাস্তায় বেরতেই ও দেখল, বাড়িওয়ালা অংশুমানবাবু নীচে নেমে এসেছেন। ওকে দেখে বললেন, 'ভোরবেলায় পুলিশ এসেছিল। আপনাকে একবার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় যেতে বলেছে।'

অংশুমানবাবুকে দেখেই রাগ হয়ে গেল জয়দেবের। বলল, 'খবরটা আগে দিতে পারলেন না?'

'কী করে দেব? আগে প্রাণ বাঁচাব, তারপর তো খবর দেব। ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করি মশাই। গলগল করে আগুন বেরুচ্ছিল তখন। হরিফাইং এক্সপিরিয়েন্স। আর আপনি এসেই বা কী করতেন? দমকল এল আধ ঘণ্টা পরে। তবুও, ভিতরের দিককার দরজা ভেঙে যতটা পেরেছি, জিনিসপত্তর বাঁচিয়েছি।' একটু আশার আলো দেখতে পেল জয়দেব—'কোথায় সেসব?'

'ভিতরের উঠোনে। যান, গেলেই দেখতে পাবেন।'

তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকে জয়দেব দেখল, দু'টো কম্পিউটার অক্ষত রয়েছে। শ'চারেক আধপোড়া বই, কয়েকটা হিসাবপত্রের ফাইল আর গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। তার মাঝে পড়ে আছে তালাবন্ধ ক্যাশ বাক্সটাও। দেখে মনে মনে অংশুমানবাবুকে ধন্যবাদ দিল জয়দেব। ইস, ভদ্রলোককে ও কড়া কথা না বললেও পারত। ক্যাশ বাক্সের তালাটা খুলে ও টাকাগুলো বের করে, প্যান্টের পকেটে রাখল। দোকানে ঢোকার দরজাটা ভাঙা। ভিতরের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে ওর মনটা হু হু করে উঠল। দোকানের সামনের দিকে শাটার নামিয়ে, কাল রাত আটটা-সাড়ে আটটার সময় ভিতরের দিককার এই দরজাতেই তিনটে তালা দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল। তখন কি জানত, আগুনে ওর কপাল পুড়বে?

স্কুলে পড়ার সময় ও প্রায়ই টিউশন থেকে ফেরার পথে বাবার দোকানে আসত। দোকান বন্ধ করার সময় ও বাবার কাছ থেকে চাবির গোছা চেয়ে নিয়ে এই দরজায় নিজে তালা লাগাত। এই কাজটা করতে ওর খুব ভাল লাগত। সেইসময় ও দেখত, দোকান বন্ধ হওয়ার পর কাগজ জ্বালিয়ে, বাবা সেটা দোরগোড়ায় ফেলে দিচ্ছেন। কেন, তা জিগ্যেস করায় বাবা বলেছিলেন, 'এটা করি কেন জানিস? কোনও ইভিল স্পিরিট দোকানের ক্ষতি করতে পারবে না।' কিন্তু সেই আগুনই ওর সর্বনাশ করে দিল!

উবু হয়ে বসে, মোহগ্রস্তের মতো জয়দেব ফাইল আর বইগুলো গোছাতে লাগল। মাথা ঠান্ডা রেখে ওকে এখন অনেক কাজ করতে হবে। আগে থানায় যেতে হবে। তারপর কথা বলতে হবে দমকলের লোকদের সঙ্গে। ফিরে এসে দোকানটা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ওকে ফের নতুন করে আসবাব বানাতে হবে। দেওয়ালগুলো রং করাতে হবে। লাখখানেক টাকা দরকার। পাবে কোথায়? দোকানে কাজ চালানোর মতো শ্রী ফিরিয়ে, বসতে না পারলে, জেলায় জেলায় বইমেলাগুলোতে ও স্টল দিতে পারবে না। ওই মেলাগুলো থেকে ভাল ইনকাম হয়। এই মুহূর্তে মায়ের কাছে হাত পাতা যাবে না। 'দিনকাল' ম্যাগাজিন বের করার সময় মা একবার ওকে টাকা দিয়েছিল। সেই টাকা এখনও ফেরত দিতে পারেনি। ফের টাকা চাইবে কোন মুখে? সব থেকে বড় কথা, ঝাড়গ্রামে মা যখন এই খবরটা পাবে, তখন ভয়ানক মুষড়ে পড়বে। জয়দেব শুনেছে, দোকানটা কেনার সময় মা নাকি নিজের গয়না বন্ধক দিয়েছিল। পরে বাবা সেই গয়না ছাড়িয়ে নেয়। সেই কারণে মায়ের সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে আছে এই দোকানটার সঙ্গে।

'এই ভয়ানক কাণ্ডটার পিছনে কে আছে জয়দা? আপনার সঙ্গে তো কারও শত্রুতা নেই।'

প্রশ্নটা শুনে জয়দেব মুখ তুলে তাকাল। কৌশিক ঝোড়ো কাকের মতো দাঁড়িয়ে। ওর পাশে সুমিতা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে,



ঘুম থেকে উঠে এসেছে। কৌশিক থাকে নাকতলার দিকে। সুমিতা গলফ গ্রিনে। ওরা খবর পেল কী করে? জয়দেব উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি না। তোমরা কখন এলে?'

'বেলা আটটায়। টিভিতে খবরটা দেখেই বেরিয়ে এসেছি। আপনার এত দেরি হল?'

'অংশুমানবাবু খবর দেননি। তোমরাই বা আমাকে ফোন করলে না কেন?'

'অনেকবার করেছি জয়দা। সুইচ অফ করা ছিল। খুলে দেখুন, প্রচুর মিসড কল পাবেন।'

সুমিতা বলল, 'আপনি আসতে দেরি করছেন দেখে কৌশিক আর আমি থানায় গিয়েছিলাম। ডায়েরি করে এলাম। একটা ইন্টারেস্টিং খবর আছে জয়দা। এখন শুনবেন? নাকি পরে বলব।'

'না, এখন বলো।'

'চায়ের দোকানের বসন্ত বলে ছেলেটা বলল, কাল রাতে গাট্টাগোট্টা টাইপের একটা লোককে ও দোকানের আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে। খুব ফরসা, আর লম্বা চুল। খালি গা, পরনে বেগুনি রঙের ধুতি। আমরা চলে যাওয়ার সময় সেই অচেনা লোকটা নাকি বাবা লোকনাথ প্রকাশনীর গাড়িবারান্দায় অনেক রাত পর্যন্ত শুয়েছিল।'

'বসন্ত দেখল কী করে? রাতে ও এখানে থাকে নাকি?'

'না রোজ থাকে না। কাল রাতে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল দোকান বন্ধ করতে। তাই সরস্বতী প্রকাশনীর বারান্দায় ও শুয়ে পড়েছিল। তখনই লোকটাকে ওর চোখে পড়ে।

শুনে জয়দেব ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'ছেলেটা আর কিছু বলল?'

'অনেক রাতে কুকুরগুলো খুব ঘেউ ঘেউ করছিল। তখন ওর ঘুম ভেঙে যায়। ও তখন দেখে, লোকটা হেঁটে হেঁটে বড় রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছে। তারপরই ও দোকান থেকে ধোঁয়া বেরতে দেখে। চেঁচামেচি করে ও সবাইকে জাগিয়ে দেয়। না হলে আরও ড্যামেজ হত।'

'পুলিশকে এসব কথা জানিয়েছ?'

'হ্যাঁ জয়দা। বসন্ত ছেলেটাকেও আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় নিয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশকে তো জানেন। উল্টে ওকেই নানারকম অড কোয়েশ্চেন করল। ছেলেটার সত্যিই খুব সাহস আছে। জানেন কী করেছে? লোকটার পিছু ধাওয়া করেছিল। পুলিশকে ও বলল, লোকটা নাকি শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে গিয়েছে। কে এই লোকটা? আপনার কি কোনও ধারণা আছে?'

'বুঝতে পারছি না ভাই।'

'এখন কী হবে জয়দা। দিনকাল-এর নেক্সট ইস্যু বেরবে কী করে?'

সুমিতা চুপ করে এতক্ষণ কথা শুনছিল। এবার বলল, 'তার মানে? কী বলছিস তুই কৌশিক? ইস্যু তো বের করতেই হবে। অ্যাট এনি কস্ট। জয়দা আপনি ঘাবড়াবেন না। প্রেসে সব মাল পাঠানো হয়ে গিয়েছে। যতদিন না দোকানটা ঠিকঠাক করা যায়, ততদিন আপনার বাড়িতে বসেই আমরা কাজ তুলে দেব। কী, আপনার আপত্তি নেই তো?'

এত দ্রুত চিন্তা জয়দেব আর করতে পারছে না। তবুও ঘাড় নাড়ল ও। সুশোভনদা কাল বিকালেই সাবধান করে দিয়েছিলেন। সুশোভনদার পিছনে যে চক্রটা লেগেছে, হয়তো তাদেরই মধ্যে কেউ টের পেয়ে গিয়েছে, দিনকাল পত্রিকার জন্য উনি এমন কোনও লেখা দিয়েছেন, যা ওদের ক্ষতি করে দিতে পারে। তাই এই আগুন। ভাড়াটে কোনও গুন্ডার হাতেও এই দায়িত্বটা ওরা দিতে পারে। কিন্তু ছবি আর লেখার কথাটা ওরা জানল কী করে? ফোন ট্যাপ করে? হতে পারে। এই প্রশ্নগুলো নিয়ে মনে মনে খেলা করার সময় হঠাৎ জয়দেবের মাথায় এল, আরে সুশোভনদার বইয়ের পাণ্ডুলিপিটা? কাল প্রুফ দেখার জন্য পাণ্ডুলিপিটা ও দোকানে রেখে গিয়েছিল। সেটা পুড়ে গেলে তো সর্বনাশ। সুশোভনদাকে ও মুখ দেখাতে পারবে না। পাণ্ডুলিপিটা ছিল সবুজ রঙের একটা ফাইলের ভিতর। উঠোনে একবার চোখ



বুলিয়ে, ডাঁই করা বইয়ের মধ্যে ও সেই ফাইলটা দেখতে পেল না।

'সুশোভনদার ম্যানুস্ক্রিপ্টটা কোথায়, তোমরা জানো?'

প্রশ্নটা শুনে সুমিতা বলল, 'ম্যানুস্ক্রিপ্টটা কাল আমি বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রুফ দেখার জন্য। ওটা ইনট্যাক্ট আছে। নিশ্চিন্ত থাকুন জয়দা, অন্তত বইমেলায় ওই বইটা বের করা যাবে।'

কৌশিক বলল, 'তা হলে সময় নষ্ট করে লাভ কী? চল সুমি, দু'একটা লোক ডেকে আনি। দোকানটা অন্তত পরিষ্কার করে ফেলা যাক।'

জয়দেব থামিয়ে দিয়ে বলল, 'না না। ডেব্রিস এখনই সরিয়ে ফেলাটা ঠিক হবে না। ইন্সিওরেন্সের লোকজন আসুক। ওরা ড্যামেজ আন্দাজ করতে চাইবে।'

কৌশিক আর সুমিতার সঙ্গেই রাস্তায় নেমে এল জয়দেব। আশপাশের প্রকাশকরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। সমবেদনা জানাতে এসেছেন। একেকজন একেকরকম কথা বলছেন। কথা বলতে ভাল লাগছিল না জয়দেবের। ও হ্যাঁ আর না-এ উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কাঁধে কার স্পর্শ পেয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল, গোপালকাকাবাবু। রাস্তার ঠিক উল্টোদিকেই বাবা



লোকনাথ প্রকাশনী। তার মালিক গোপাল মাইতি ঝাড়গ্রামে ওদের প্রতিবেশী। বাবার অনেক আগে থেকে বইয়ের বিজনেসে আছেন। একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে কাকাবাবু বললেন, 'বাবা জয়, এটা বাড়িওয়ালার কাণ্ড নয় তো?'

শুনে চমকে উঠল জয়দেব, 'কী বলছেন আপনি? অসম্ভব। অংশমানবাবু কিছুতেই এ কাজ করতে পারেন না। আমার অন্তত মনে হয় না।'

'জগতে কোনও কিছু অসম্ভব নয় বাবা। ইদানীং প্রোমোটাররা ঘুরঘুর করছে ওঁর কাছে। তুমি ছাড়া এই বাড়িতে আর কোনও ভাড়াটে নেই। তোমাকে তুলে দিতে পারলে, ঝরঝরে এই বাড়িটা উনি ছেড়ে দিতে পারেন প্রোমোটারের হাতে। তারপর আর কী...মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংস।'

'কিন্তু কাকাবাবু, ওপরতলায় যে উনি ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন! নীচের তলায় আগুন লাগানোর ঝুঁকি কি কখনও নিতে পারেন?'

'খোঁজ নিয়ে দেখো, ওঁর ফ্যামিলির কেউ কাল রাতে ওপরতলায় ছিলেন না। কাল সকালেই ওদের সবাইকে আমি ট্যাক্সিতে উঠতে দেখেছি। থাক বাবা, আমার কথা যখন তোমার মনঃপূত হচ্ছে না, তখন বিশ্বাস করতে হবে না। তুমি জীবনের ছেলে বলেই কথাগুলো বললাম। যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এবার একটু চোখ-কান খোলা রেখে চলো। আমি যাই, দোকান খুলতে হবে।'

গোপালকাকাবাবু চলে যাওয়ার পর হতভম্ব হয়ে জয়দেব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অংশুমানবাবু এত ক্ষতি করে দেবেন, মনে হয় না। ভদ্রলোক অন্য বাড়িওয়ালাদের মতো নন। কখনও ভাড়া চাইতে আসেন না। দেরি হলে কখনও তাগাদা দেন না। একটা সময় সরকারি চাকরি করতেন। রিটায়ার করার পর বিন্দাস আছেন। রোজ বিকেলে সমবয়সিদের সঙ্গে আড্ডা মারতে যান কলেজ স্কোয়ারে। জয়দেব শুনেছে, ওঁর দুই ছেলেই থাকেন বিদেশে। ওঁর পরিবার বলতে আছেন স্ত্রী, এক বিবাহিতা মেয়ে আর দুই নাতি-নাতনি। জামাইকে মাঝে মধ্যে আসতে দেখেছে জয়দেব। অংশুমানবাবু কোনওদিনই এসে বলেননি, আপনি মশাই ঘরটা ছেড়ে দিন। ওঁর যদি বদমতলব থাকত, তা হলে ভিতরের দরজার তালা ভেঙে, কিছু জিনিস বাঁচানোর চেষ্টা উনি করতেন না।

গোপালকাকাবাবুর কথা মাথা থেকে সরিয়ে নিল জয়দেব। সিঁড়ি দিয়ে এক ধাপ উঠে ও দোকানের ভিতর গিয়ে দাঁড়াল। এই



দোকানটা কত কষ্ট করে দাঁড় করিয়েছিলেন বাবা। সব শেষ হয়ে গেল। নির্জন ঘরে ও যেন বাবার দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল। ডানদিকের কোণে একটা বড় টেবিল ছিল আগে। দেওয়ালের দিকে পিঠ রেখে বাবা চেয়ারে বসতেন। পয়লা বৈশাখের দিনটা তখন কী আনন্দেরই না ছিল! দোকানটার চেহারাই পাল্টে যেত লেখক আর মফস্বলের এজেন্টদের ভিড়ে। 'সেন মহাশয়' থেকে মিষ্টির প্যাকেট আসত। স্কুলে পড়ার সময় এমনই একটা দিনে লেখক সমরেশ বসুকে একবার দেখেছিল জয়দেব। বাবা পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর ওঁর মাথায় হাত রেখে সমরেশ বসু বলেছিলেন, 'তুমি জীবনে কী হতে চাও বাবা?'

জয়দেব কিছু না ভেবেই বলেছিল, 'আপনার মতো সাহিত্যিক হতে চাই।'

শুনে হা হা করে হেসে উঠেছিলেন সমরেশ বসু, 'বেশ বেশ। বলো তো, তোমার নামেই একজন খুব বিখ্যাত কবি আছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম কী? যদি বলতে পারো, তা হলে বুঝব, তুমি সাহিত্যিক হতে পারবে।'

জয়দেব চট করে বলেছিল, 'গীতগোবিন্দ।'

খুশি হয়ে সমরেশ বসু তখন বলেছিলেন, 'গুড, ভেরি গুড। আশীর্বাদ করি বাবা, তুমি আমার থেকেও বড় হও।' এই তো এসব সেদিনের কথা। বাবার মুখটা সেদিন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে ফিরে মায়ের কাছে গল্প করেছিলেন সমরেশ বসুর আশীর্বাদ নিয়ে। দৃশ্যগুলো মনে পড়তেই জয়দেবের চোখে জল এসে গেল। ঠিক সেইসময়েই ওর মোবাইল ফোনটা বাজতে শুরু করল। হয়তো চেনা পরিচিত কেউ টিভিতে আগুন লাগার খবরটা শুনেছেন। সমবেদনা জানাতে চান। পকেট থেকে সেটটা বের করে, জয়দেব পর্দায় সুশোভনদার নামটা দেখতে পেল। ও



কিছু বলার আগেই চাপা গলায় সুশোভনদা বলতে শুরু করলেন, 'খবরটা টিভিতে দেখলাম। জানি, এসময় ফোন করা আমার পক্ষে বিপজ্জনক। তবুও না করে থাকতে পারলাম না।'

ঘরের ভিতর কথা ভাল শোনা যাচ্ছে না। সুশোভনদার সঙ্গে কথা বলার জন্য জয়দেব ফের রাস্তায় নেমে এল। তাড়াতাড়ি জিগ্যেস করল, 'আপনি এখন কোথায়?' রাস্তায়...আশপাশে অনেকেই দাঁড়িয়ে। ইচ্ছে করেই সুশোভনদার নামটা ও উচ্চারণ করল না।

'জানতে চেও না। তোমার জন্য আমার খারাপই লাগছে। দয়া করে আমার আর্টিকেলটা তুমি ছেপো না ভাই। তা হলে তোমার আরও বিপদ হবে।'

অনুরোধটা না-শোনার ভঙ্গিতে জয়দেব বলল, 'বাকি দু'টো ছবির কোনও হদিশ পেলেন?'

'চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। শোনো, যে কারণে তোমায় ফোনটা করলাম। ইন্ডিয়ান মিউজিয়মে আমার এক ছাত্র আছে। নাম পর্ণব ঘোষদস্তিদার। ওখানকার সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার। পারলে ওর সঙ্গে একবার গিয়ে দেখা করো। ও সব জানে। তোমাকে হেল্প করতে পারবে।'

'সাবধানে থাকবেন দাদা।'

'সাবধানেই আছি। রোজ আমাকে হোটেল বদলাতে হচ্ছে। তবুও ওরা খবর পেয়ে যাচ্ছে। এমন শক্তিশালী ওদের নেটওয়ার্ক। আপাতত ছাড়ি। দরকার হলে পরে আবার তোমায় ফোন...'। আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন সুশোভনদা। কিন্তু হঠাৎ লাইনটা কেটে দিলেন।

পরের এপিসোড আগামী রোববার

অলংকরণ শান্তনু দে



হরি ঘোষ স্ট্রিট

লটারি কমিটির প্রয়োজনে ১৮২৫ সালে আই পি শক ও টি প্রিন্সেপ কলকাতার যে মানচিত্র তৈরি করেন তাতে প্রথম এই রাস্তার নাম দেখা যায়। গ্রে স্ট্রিট বা অধুনা অরবিন্দ সরণি থেকে নয়ন চাঁদ দত্ত স্ট্রিটে এসে পড়েছে।

হরি ঘোষ ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মুঙ্গের দুর্গের দেওয়ান। বাংলা ও ফারসিতে তো পণ্ডিত ছিলেন বটেই, ইংরেজিতেও তাঁর দখল ছিল। ঘোষ পরিবার কলকাতার বনেদি পরিবার। বলা হয়, গৌড়রাজ আদি শূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থকে আমন্ত্রণ করে বঙ্গদেশে এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে মকরন্দ ঘোষ থেকে এই বংশের সূত্রপাত। হরি ঘোষ দেওয়ানি পদের কল্যাণে বহু অর্থোপার্জন করেন। যদিও তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সহজ সরল অনাড়ম্বর। অবসরের পর হরি কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। কলকাতায় তিনি বহু দুঃস্থ ছাত্রকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে। এই কারণে তাঁর বাড়িকে লোকে রঙ্গ করে 'হরি ঘোষের গোয়াল' বলত। শেষ জীবন হরি ঘোষ কাশীতে কাটান।

বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট ও তারক প্রামাণিক রোড

বারাণসী ঘোষ ছিলেন ২৪ পরগণার কালেক্টর মিস্টার গ্ল্যাডউইনের দেওয়ান। জোড়াসাঁকোর শান্তিরাম সিংহের মেয়েকে বিয়ে করে বসতবাটি তৈরি করেন জোড়াসাঁকোতেই। এখানে তাঁর নামে চারটে রাস্তা আছে। বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট, বারাণসী ঘোষ লেন, বারাণসী ঘোষ সেকেন্ড লেন ও থার্ড লেন। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ তৈরি হওয়ার পর রাস্তাটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ পর্যন্ত অংশটির নাম ১৯৩৭ সালে রাখা হয় তারক প্রামাণিক রোড। তারকনাথ এই রাস্তাটিতে বাস করতেন। তিনি (১২২৩-১২৯১) দানশীল ছিলেন। ১২ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় পড়া শেষ করে বাবার ব্যবসায় যোগ দেন। তাঁর বাবা গুরুচরণের ছিল এদেশে প্রথম জাহাজ মেরামতির কারখানা। তারকনাথ তার উন্নতি ঘটান। শুরু করেন কাঁসা পিতলের ব্যবসা। বড়বাজার ও চাঁদনিতে তাঁদের প্রকাণ্ড আড়ত ছিল। জাহাজের তলদেশে ব্যবহারের পেতল ও তামার চাদর এই আড়ত থেকেই বিদেশে রপ্তানি হত। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি ধারণ উপলক্ষে ১৮৭৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দরবারে তারকনাথকে তাঁর দানশীলতার জন্য 'সার্টিফিকেট অফ অনার' প্রদান করে সম্মানিত করা হয়।

সংকলন : ঈপ্সিতা হালদার

ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়



কলকাতার গলিপথ


SICK LEAVE
INDIA
SEAGRAM'S
IMPERIAL
BLUE
Superhits
Men will be men
O&M 550
Music CDs